রূপালী দ্বীপ

হুমায়ূন আহমেদ



প্রস্তাবনা

একুশ খুব অদ্ভুত একটা বয়স।

এই বয়সে মাথায় বিচিত্র সব পাগলামি ভর করে। বুকের ভেতর থাকে এক ধরনের অস্থিরতা। সেই অস্থিরতার একটি রূপ হল — "কী যেন নেই", "কী যেন নেই" অনুভূতি। সেই "কী যেন নেই"-কে খোঁজার চেষ্টাও এই বয়সেই প্রথম দেখা দেয়। পৃথিবীর বেশির ভাগ সাধুসন্ত এই বয়সে গৃহত্যাগ করেন।

চার বছর আগে জানুয়ারি মাসের এক প্রচণ্ড শীতের রাতে একুশ বছর বয়েসী একদল ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে বসেছিলাম। উপন্যাসের নাম 'দারুচিনি দ্বীপ'। সেই উপন্যাসে একদল ছেলেমেয়ে ঠিক করল, তারা দল বেধে বেড়াতে যাবে প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে। সেখানে কাটাবে পূর্ণচন্দ্রের একটি অপূর্ব রাত। আমি উপন্যাস শেষ করব জোছনার সুন্দর একটা বর্ণনা দিয়ে।

পাত্র-পাত্রীদের আমি কিন্তু প্রবাল দ্বীপ পর্যন্ত নিতে পারিনি। তার আগেই উপন্যাস শেষ করতে হয়েছে, কারণ — আমি নিজে তখনো দ্বীপে যাইনি। স্বপ্নের সেই দ্বীপ কেমন আমি জানতাম না।

এখন জানি। সেই অপূর্ব দ্বীপে আমি নিজে এক টুকরো জমি কিনে কাঠের একটা ছোট্ট ঘর বানিয়েছি। তার নাম দিয়েছি — "সমুদ্র বিলাস"। ফিনিক-ফোটা জোছনায় আমি দেখেছি জ্বলন্ত সমুদ্র-ফেনা। আহা, কী দৃশ্য ! সেই প্রায় পরাবাস্তব ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, ঐ তরুণ-তরুণীদের শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাই-না সমুদ্রের কাছে !

যেখানে শেষ করেছিলাম 'দারুচিনি দ্বীপ' সেখান থেকেই শুরু হোক নতুন গল্প 'রূপালী দ্বীপ'। আসুন, রূপালী দ্বীপের পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

ঘন্টা পড়ে গেছে। কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে এক্ষুনি ছেড়ে দেবে চিটাগাং মেল। দারুচিনি দ্বীপের যাত্রীরা সবাই উঠে পড়েছে ট্রেনে। একজন শুধু ওঠেনি। সে হল — বল্টু। বল্টুর ভাল নাম অয়ন। অর্থাৎ পর্বত। পর্বত নাম হলেও এই ছোটখাট মানুষটা মাথা নিচু করে প্ল্যাটফর্মের অন্ধকার কোণায় দাঁড়িয়ে। সে যাচ্ছে না, অথচ তারই যাবার আগ্রহ ছিল সবচে' বেশি। সে চাঁদার টাকাটা জোগাড় করতে পারেনি। অথচ তার আশা ছিল, শেষ মুহূর্তে হলেও টাকা জোগাড় হবে। হয়নি।

প্ল্যাটফর্মে দারুচিনি দ্বীপের দলটাকে বিদায় জানাতে মুনা এসেছে বাবার সঙ্গে। মুনার ভাই সঞ্জু যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, মুনা তার ভাইকে বিদায় জানাতেই এসেছে। এই প্রকাশ্য কারণের বাইরে আছে একটি অপ্রকাশ্য কারণ। প্রকাশ্য কারণ হল — অয়ন। মুনা আসলে এসেছে অয়নকে বিদায় জানাতে। অতি প্রিয়জনদের হাত নেড়ে বিদায় জানাতে খুব কষ্ট হয়, আবার এই কষ্টের সঙ্গে এক-ধরণের আনন্দও থাকে। মুনা মা'র কাছ থেকে টাকা চুরি করে অয়নকে একটা হালকা নীল রঙের স্যুয়েটার কিনে দিয়েছে। কথা ছিল এই স্যুয়েটার গায়ে সে ট্রেনে উঠবে। মুনা কল্পনার দৃষ্টিতে পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে — অয়ন নীল রঙের স্যুয়েটার পরে ট্রেনের কামরা থেকে গলা বের করে তার দিকে তাকিয়ে খুব হাত নাড়ছে। আর সে দেখেও না দেখার ভান করছে। সে ঠিক করে রেখেছে, ভাল করে তাকাবেও না। অয়ন ভাইয়ের দিকে ভাল করে তাকালেই তার চোখে পানি এসে যায়। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা কেন হয় কে জানে? আজ সে এটা হতে দেবে না। কিছুতেই তাকাবে না। দরকার হলে চোখ বন্ধ করে রাখবে।

গার্ড সবুজ ফ্ল্যাগ দোলাচ্ছে। সবাই ট্রেনে উঠে পড়েছে। শুধু মোতালেব প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন চোখে এদিক-ওদিক দেখছে। সবাই আছে। এক্ষুনি ট্রেন ছেড়ে দেবে। তাহলে কি অয়ন যাচ্ছে না? মোতালেব ভাইকে জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা লাগছে। মুনার ধারণা, প্রশ্নটা করলেই মোতালেব ভাই অনেক কিছু টের পেয়ে যাবেন। তিনি ভুরু কুঁচকে তাকাবেন। যে তাকানোর অর্থ হচ্ছে — হঠাৎ করে অয়নের কথা কেন? ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা যে কী তা মুনা কাউকে বলতে চায় না। কাউকে না। অয়নকে তো কখনোই না। মরে গেলেও সে তার গোপন ভালবাসা কাউকে জানাবে না। অন্যদের মতো অয়নকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবে। অন্যরা যেমন ডাকে বল্টু। সেও ডাকবে বল্টু ভাই।

মোতালেব ট্রেনের কামরায় উঠতে যাচ্ছে। মুনা আর থাকতে পারল না। প্রায় ফিসফিস করে বললো, মোতালেব ভাই, অয়ন ভাইকে তো দেখছি না। উনি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না?

মোতালেব বিরক্ত মুখে বলল, যাওয়ার তো কথা, গাধাটা এখনো কেন আসছে না কে জানে? ট্রেন মিস করবে। গাধাটা সবসময় এরকম করে। আগে একবার পিকনিকে গেলাম। সে গেল না। পরে শুনি, চাঁদার টাকা জোগাড় হয়নি। আরে, একজন চাঁদা না দিলে কী হয়? সবাই তো দিচ্ছি।

মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল, ওনার কি টাকার জোগাড় হয়নি?

মোতালেব বলল, কী করে বলব। আমাকে তো কিছু বলেনি।

মুনা অসম্ভব রকম মন-খারাপ করে বাবার কাছে চলে এল। আর তখনি সে অয়নকে দেখল। অয়ন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায়, সে চাচ্ছে না কেউ তাকে দেখে ফেলুক। মুনা চেঁচিয়ে ডাকল, অয়ন ভাই! অয়ন ভাই!

অয়ন প্ল্যাটফর্মে গাদা করে রাখা প্যাকিং বাক্সগুলির আড়ালে সরে গেল। মুনা এগিয়ে গেল। পিছনে এলেন সোবাহান সাহেব।

মুনা বলল, অয়ন ভাই, আপনি যাচ্ছেন না? ট্রেন তো ছেড়ে দিচ্ছে।

অয়ন কী বলবে ভেবে পেল না। সোবাহান সাহেব উত্তেজিত গলায় বললেন, দৌড়ে গিয়ে ওঠো। সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে।

অয়ন নিচু গলায় বলল, চাচা, আমি যাচ্ছি না।

'যাচ্ছ না কেন?'

'টাকা জোগাড় করতে পারিনি। একজনের দেয়ার কথা ছিল, সে শেষ পর্যন্ত . . .'

গার্ড বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছে। ট্রেন নড়তে শুরু করেছে। অয়ন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

মুনার চোখে পানি এসে গেছে। সে ভেজা চোখে তার বাবার দিকে তাকিয়ে আছে।

সোবাহান সাহেব পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে শান্তগলায় বললেন, বাবা, এই নাও, এখানে ছয় শ' টাকা আছে। তুমি যাও। দৌড়াও।

অয়ন ধরা গলায় বলল, বাদ দিন চাচা। আমি যাব না।

অয়নের খুব কষ্ট হচ্ছে। সে কখনোই কোথাও যেতে পারে না, সে জন্যে খুব কষ্ট তো তার হয় না। আজ কেন হচ্ছে?

সোবাহান সাহেব বললেন, এক থাপ্পড় দেব। বেয়াদব ছেলে। দৌড় দাও। দৌড় দাও।

মুনা বলল, যান অয়ন ভাই, যান। প্লীজ!

অয়ন টাকা নিল।

সে দৌড়াতে শুরু করেছে। তার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে মুনা। কেন ছুটছে তা সে নিজেও জানে না। ·

দলের সবাই জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকাচ্ছে। মোতালেব এবং সঞ্জু হাত বের করে রেখেছে — কাছাকাছি এলেই টেনে তুলে ফেলবে। এই তো আর একটু। আর একটু . . . ।

সোবাহান সাহেব চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছেন — "হে মঙ্গলময়! এই ছেলেটিকে দারুচিনি দ্বীপে যাবার ব্যবস্থা তুমি করে দাও।"

ট্রেনের গতি বাড়ছে।

গতি বাড়ছে অয়নের। আর ঠিক তার পাশাপাশি ছুটছে মুনা। সে কিছুতেই অয়নকে ট্রেন মিস করতে দেবে না। কিছুতেই না।

এখন থেকেই শুরু হল আমাদের নতুন গল্প . . .



বেঁটে মানুষ ভাল দৌড়তে পারে না। বেঁটে মানুষের পা থাকে খাটো। খাটো পায়ে লম্বা স্টেপ নেয়া যায় না। কিন্তু বল্টু প্রায় উড়ে যাচ্ছে। সে অসাধ্য সাধন করল, ছুটন্ত ট্রেন প্রায় ধরে ফেলল। তার বন্ধুরা ট্রেনের দরজা-জানালায় ভিড় করে আছে। রানা হাত বের করে আছে। একবার বল্টুর হাত ধরতে পারলেই টেনে তুলে ফেলবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে — বল্টুর পাশাপাশি ছুটছে মুনা। ট্রেনের কামরা থেকে মুখ বের করে যারা উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে তাদের সবার মনে প্রশ্ন — এই মেয়েটা পাগলের মতো দৌড়াচ্ছে কেন? এর তো দারুচিনি দ্বীপে যাবার কথা না। মুনাও যে শেষ মুহূর্তে বল্টুর সঙ্গে দৌড়াতে থাকবে এবং অবিকল বল্টুর মতোই ট্রেনের দরজার হাতল চেপে ধরবে, তা সে নিজেও বুঝতে পারেনি। যখন বুঝতে পেরেছে তখন আর সময় নেই। ট্রেনের চাকায় গতির কাঁপন। বেগ ক্রমেই বাড়ছে। এখন প্লাটফর্মে নেমে যাবার উপায় নেই।

প্ল্যাটফর্মে হতভম্ব মুখে মুনার বাবা সোবাহান সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি এখনো পুরো ঘটনাটা বুঝতে পারছেন না। মেয়েটা হঠাৎ তার পাশ থেকে এমন ছুটতে শুরু করল কেন? কেনই-বা দৌড়ে ট্রেনে উঠে পড়ল? ট্রেনে তার বড় ভাই আছে, এটা একটা ভরসা। অবশ্যি সঞ্জু না থাকলেও সমস্যা হত না। এই ছেলেমেয়েরা তাঁর মেয়েটার কোনো অনাদর করবে না। এরা সঞ্জুর বন্ধু, তিনি এদের খুব ভাল করেই চেনেন। মুনা ট্রেনের জানালা থেকে মুখ বের করে বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। সোবহান সাহেব এত দূর থেকে সেই হাসি দেখলেন না। তবে তিনি হাত নাড়লেন। হাত নেড়ে একধরনের অভয় দিলেন, বলার চেষ্টা করলেন, "সব ঠিক আছে।"

বাবার দিকে তাকিয়ে মুনার কান্না পাচ্ছে। একা একা দাঁড়িয়ে থাকা বাবাকে কী অসহায় দেখাচ্ছে! যেন একজন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মানুষ, যার সব প্রিয়জন একটু আগেই ট্রেনে করে অনেক অনেক দূরে চলে গেছে, যাদের আর কখনোই ফিরে পাওয়া যাবে না।

মুনার মনে হচ্ছে, তার বাবা কাঁদছেন। তিনি অল্পতেই কাঁদেন। মুনা যখন এসএসসি পরীক্ষা দিতে গেল সেদিনও তিনি কাঁদলেন। চোখ মুছতে মুছতে বললেন,

আহা, দেখতে দেখতে মেয়েটা এত বড় হয়ে গেল! আজ এসএসসি দিচ্ছে। দু'দিন পরে বিয়ে দিতে হবে।

যেদিন এসএসসি-র রেজাল্ট হল সেদিনও কাঁদলেন। রুমাল চোখে চেপে ধরে গাঢ় স্বরে বললেন, আমি খুব খুশি হয়েছি মা, খুবই খুশি। সেকেন্ড ডিভিশন এমন খারাপ কিছু না, ম্যাট্রিকের সেকেন্ড ডিভিশনও খুব টাফ। বাবা তার জন্যে রাজশাহী সিল্কের শাড়ি কিনে আনলেন। পরীক্ষা পাসের উপহার। মুনার জীবনের প্রথম শাড়ি। সারা জীবনে মুনা নিশ্চয়ই অনেক জামাকাপড় কিনবে। অনেক শাড়ি কিনবে — কিন্তু জীবনের প্রথম শাড়িটার কথা কখনো ভুলবে না। আচ্ছা, এই তথ্য কি বাবা জানেন?

বাতাসে মুনার চুল উড়ছে, গায়ের ওড়না উড়ছে। আর সে মনে মনে বলছে, কেন আমার বাবা এত ভালমানুষ হলেন? কেন? কেন?

দলের সবাই চোখ বড় বড় করে মুনার দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কথা বলছে না। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটাতে সময় নিচ্ছে। ট্রেনের অন্য যাত্রীরাও ব্যাপারটা বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখছে। মুনাকে তেমন বিচলিত মনে হচ্ছে না। দৌড়ে ট্রেনে এসে ওঠার পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সারা মুখে ঘাম। ওড়নার প্রান্ত দিয়ে সে মুখের ঘাম মুছল। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে রানার সামনে। বসার জায়গা আছে। ইচ্ছে করলে বসতে পারে, — বসছে না। ছেলেরা সিগারেট খাবে বলে আলাদা বসেছে। মুনা মেয়েদের দেখতে পারছে না। সে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েদের দিকে পেছন ফিরে।

সবার প্রথমে নিজেকে সামলাল রানা। সে থমথমে গলায় প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বলল, তুই কী মনে করে ট্রেনে লাফিয়ে উঠলি? চুপ করে আছিস কেন? জবাব দে। আনসার মি। এরকম ইডিওটিক একটা কাজ করলি কীভাবে?

মুনা কিছু বলল না। সে তার বড় ভাই সঞ্জুর দিকে তাকাল। সঞ্জু জানালা দিয়ে মুখ বের করে আছে। মনে হচ্ছে ট্রেনের কামরায় এতবড় নাটকীয় ঘটনা যে ঘটে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সঞ্জুর কোনো যোগ নেই। সে বাইরের অন্ধকার দেখতেই পছন্দ করছে। ভাবটা এরকম যেন অন্ধকারে অনেক কিছু দেখার আছে। মুনা নামের ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী এই মেয়েটিকে সে চেনে না।

রানা এবার হুঙ্কার দিল, কথা বল। মুখ সেলাই করে রেখেছিস কেন? কী মনে করে তুই লাফ দিয়ে চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়লি? পা পিছলে চাকার নিচে গিয়ে মরেও তো যেতে পারতিস।

'মরিনি তো। বেঁচে আছি।'

'ভাগ্যক্রমে বেঁচে আছিস। কেন উঠলি এখন বল।'

মুনা সহজ গলায় বলল, আমি নিজেও জানি না কেন উঠেছি। জানলে বলতাম। ঝোঁকের মাথায় উঠেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ক্ষমা চাইতে হবে? কার কাছে ক্ষমা চাইব? তোমাদের কাছে, না ট্রেনের কাছে?

'কথা ঘোরাচ্ছিস কেন? স্ট্রেইট কথার স্ট্রেইট জবাব দে।'

আনুশকা বলল, রানা, আপাতত তোমার জেরা বন্ধ রাখো। মেয়েটা হাঁপাচ্ছে। ও শান্ত হোক। মুনা, তুমি এখানে বসো।

'আমি বসব না।'

'বসবে না কেন?'

'আমি তেজগাঁ স্টেশনে নেমে যাব। আমাকে নিয়ে আপনাদের কাউকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

রানা গম্ভীর গলায় বলল, তেজগাঁ নেমে যাবি মানে? এই ট্রেন তেজগাঁ থামে না। ফার্স্ট স্টপেজ ভৈরব।'

'আমি চেইন টেনে ট্রেন থামাব। তারপর বেবিট্যাক্সি নিয়ে বাসায় চলে যাব।'

রানা হুংকার দিয়ে বলল, তোর সাহস বেশি হয়ে যাচ্ছে মুনা। তুই টু মাচ সাহস দেখাচ্ছিস। মেয়েদের টু মাচ কারেজ ভয়ংকর।

মুনা ঝাঁঝালো গলায় বলল, তুমি উল্টা-পাল্টা ইংরেজি বলবে না তো রানা ভাই, অসহ্য লাগে।

'আমি উল্টা-পাল্টা ইংরেজি বলি?'

'হ্যাঁ, বল। আর অকারণে ধমক দাও। শুধু শুধু আমাকে ধমকাচ্ছ কেন? আমি কী করেছি?'

'কথা নেই, বার্তা নেই, তুই লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লি আর এখন বলছিস, আমি কী করেছি?'

'বলেছি তো, নেমে যাব। বলার পরেও ধমকাচ্ছ কেন?'

মুনার গলা ভারী হয়ে এল। নিজেকে সামলানোর আগেই চোখে পানি এসে গেল। অয়ন ভাই দেখে ফেলছে না তো? সে বিবর্ণ মুখে অয়নের দিকে তাকাল। যা ভয় করেছিল, তাই। অয়ন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। মুনা কান্না চাপতে গিয়ে আরো সমস্যায় পড়ল। সমস্ত শরীর ভেঙে কান্না আসছে।

রানা বিরক্ত গলায় বলল, কান্না শুরু করলি কী মনে করে? স্টপ ক্রাইং। শেষে থাবড়া খাবি।

মুনা আরো শব্দ করে কেঁদে উঠল।

ট্রেনের গতি কমে আসছে। তেজগাঁ চলে এল বোধহয়। ট্রেন থামবে না, তবে ধীরগতিতে এগুবে। মুনা দরজার দিকে এগুচ্ছে। রানা বলল, তুই যাচ্ছিস কোথায়? মুনা জবাব দিল না। আনুশকা উঠে এল। মুনার পিঠে হাত রেখে কোমল গলায় বলল, মুনা, তুমি আমার পাশে এসে বসো। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ।

মুনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি আপনাদের সঙ্গে গিয়ে কী করব? আপনারা বন্ধুরা গল্প করতে করতে যাবেন। আমি কী করব? আমি কার সঙ্গে গল্প করব?

আনুশকা মুনার কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমার কিন্তু ধারণা, গল্প করার মানুষ তোমারও আছে। তোমাকে কাঁদতে দেখে সে খুব অস্থির হয়ে পড়েছে। তুমি যদি তেজগাঁ স্টেশনে নেমে পড় সেও নেমে পড়বে।

'আপা, আপনি চুপ করুন তো!'

'বেশ, চুপ করলাম। তুমিও শান্ত হয়ে বসো। আমার পাশে বসতে ইচ্ছা না হলে যেখানে ইচ্ছা বসো। বসবে আমার পাশে?'

'না।'

মুনা করিডোর ধরে এগুচ্ছে। রানা যাচ্ছে তার পেছনে পেছনে। এই মেয়েকে চোখের আড়াল করা ঠিক হবে না। ডেঞ্জারাস মেয়ে। কী করে বসে কে জানে? হয়ত ফট করে লাফ দিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে গেল। যে চলন্ত ট্রেনে উঠতে পারে, সে নামতেও পারে। রানা নরম গলায় বলল, মুনা শোন, আমার উপর রাগ করিস না। এতগুলি লোক নিয়ে যাচ্ছি, টেনশানে মেজাজ হট হয়ে থাকে — যাচ্ছিস কোথায়? বোস — জানালার কাছে একটা সীট খালি আছে।

মুনা বসল। রানা তার পাশে বসতে বসতে বলল, তোর পাশে কিছুক্ষণ বসি, তোর রাগ কমলে উঠে যাব।

'আমার রাগ কমেছে। তুমি উঠে যেতে চাইলে উঠে যেতে পার।'

'এতগুলি মানুষকে গাইড করে নিয়ে যাওয়ার টেনশান তুই বুঝবি না।'

'তুমি গাইড করে নিচ্ছ মানে? গাইড করে নেয়ার এর মধ্যে কী আছে? সবাই ট্রেনে উঠেছে — ট্রেন যাচ্ছে।'

'ব্যাপারটা এত সোজা না রে মুনা। একটা দলকে নিয়ে বেড়াতে যাবার কী সমস্যা তা শুধু দলপতিই জানে। আর কেউ জানে না। দলপতি হল একটা দলের সবচে' লোনলি মানুষ। নিঃসঙ্গ শেরপা ।'

'তুমি বুঝি দলপতি?'

বলতে বলতে মুনা ফিক্ করে হেসে ফেলল। রানার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বড় ফিচেল টাইপ মেয়ে। এই মেয়ে ভোগাবে বলে মনে হয়। তেজগাঁ স্টেশনে চেইন

টেনে তাকে নামিয়ে দেয়াই ভাল ছিল। রানা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, টিকেট চেকার এলে কী বলব বুঝতে পারছি না। দু'জন যাচ্ছে উইদাউট টিকেট। তুই আর জরী। একজনেরটা হলে সামাল দেয়া যেত। দু'জনেরটা কীভাবে সামলাব?

'জরী আপার টিকেট নেই?'

'ওর টিকেট থাকবে কেন? ওর কি যাওয়ার কথা? ওকে স্টেশনে দেখে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। টেনশানে ব্রহ্মতালু শুকিয়ে গেছে। অথচ সবাই নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। এদের নিয়ে বের হওয়টাই চূড়ান্ত বোকামি হয়েছে। ভেরি গ্রেট মিসটেক। মিসটেক অব দ্য সেনচুরি।'

জরী বসেছে জানালার পাশে। সে জানালা দিয়ে মুখ বের করেছে। নিজেকে আড়াল করার জন্যে বড় করে ঘোমটাও দিয়েছে। তাকে লাগছে নতুন বৌয়ের মতোই। আর আসলেই তো সে নতুন বৌ। আজ তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। সব ঠিকঠাক মতো হলে এতক্ষণে সে থাকত বাসরঘরে, স্বামীর সঙ্গে। স্বামীর অধিকার ফলাবার জন্যে লোকটা হয়ত এতক্ষণ তাকে নিয়ে চটকা-চটকি শুরু করত।

জরী বিয়ের আসর থেকে পালিয়েছে। তার দু'হাতে মেহেদির সুন্দর ডিজাইন। গায়ের শাড়িটি লাল বেনারসী। গয়না যা ছিল সে খুলে হাতব্যাগে রেখেছে। শাড়ি বদলানো হয়নি। আনুশকার একটা শাড়ি নিয়ে ট্রেনের বাথরুমে গিয়ে বদলে এলে হয়। ইচ্ছা করছে না। বেনারসী পরে ট্রেনের জানলায় মাথা রেখে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে। অনেক দিন পর নিজেকে মুক্ত লাগছে। জরী তার বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে। তার বন্ধুরা কেউ এখনো জিজ্ঞেস করেনি, কেন জরী বিয়ের আসর ছেড়ে পালিয়ে এল। সবাই এমন ভাব করছে যেন এটাই স্বাভাবিক। এখানে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। জরী ঠিক করেছে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না, সে নিজ থেকেই বলবে। কিছুই সে গোপন করবে না, কারণ তারা যাচ্ছে দারুচিনি দ্বীপ। তারা ঠিক করে রেখেছে, দারুচিনি দ্বীপে তাদের মধ্যে কোনো আড়াল থাকবে না। তারা তাদের মধ্যকার সব ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা দূর করবে।

জরীর পাশে বেশ কিছু খালি জায়গা। মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করেই সবাই মিলে জরীকে আলাদা থাকতে দিচ্ছে। সবচে' ভাল হত সে যদি অন্য কোনো কামরায় খানিকক্ষণ বসে থাকতে পারত। তা সম্ভব না। বিয়ের সাজে সাজা একটি মেয়ে কোনো-এক কামরায় সঙ্গীহীন একা বসে আছে, এই দৃশ্য কেউ সহজভাবে নিতে পারবে না, বরং এই-ই ভাল। সে আছে বন্ধুদের মাঝে। বন্ধুরা তাকে আলাদা থাকতে দিচ্ছে। কেউ তার দিকে তাকাচ্ছেও না। এখন তারা চা খাচ্ছে। ট্রেনের বুফে কারের কুৎসিত চা। কিছুক্ষণ পরপর তাই খাওয়া হচ্ছে। মহানন্দে খাওয়া হচ্ছে। সেই খাওয়ারও একেক সময় একেক কায়দা, এখন খাওয়া হচ্ছে পিরিচে। দশজন

ছেলেমেয়ে পিরিচে ঢেলে শব্দ করে চা খাচ্ছে। মোটামুটি অদ্ভুত দৃশ্য। কামরার অন্য যাত্রীরা কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছে না। কুড়ি–একুশ বছরের একদল ছেলেমেয়েকে সবসময়ই বিপজ্জনক ধরা হয়। এদের কেউ ঘাঁটাতে চায় না।

যাত্রীদের মধ্যে একজনের কৌতূহল প্রবল হওয়ায় সে বিপজ্জনক কাজটি করে ফেলল। মোতালেবকে বলল, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

মোতালেব তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন করেছেন। মানব সম্প্রদায় কোথায় যাচ্ছে তা সে জানে না। জানলে মানব সম্প্রদায়ের আজ এই দুর্গতি হত না।

যাত্রীদের বেশির ভাগই হাসছে। শুধু প্রশ্নকর্তা এবং মোতালের এই দু'জন গম্ভীর মুখে দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। মোতালেবের অনেক দায়িত্বের একটা হচ্ছে পুরো দলটাকে হাসাতে হাসাতে নিয়ে যাওয়া। সে এই দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করছে।

সবাই হাসছে, শুধু জরী হাসছে না। সে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। এক– সময় সে মনে মনে বলল, আল্লাহ্, তুমি আমার মনটা ভাল করে দাও।

আনুশকা বলল, জরী, তোর ঠাণ্ডা লাগবে। মাথা ভেতের টেনে নে। কচ্ছপের মতো সারাক্ষণ মাথা বের করে রেখেছিস কেন?

জরী বলল, আমার ঠাণ্ডা লাগছে না।

'বাইরে দেখার কিছু নেই, অন্ধকারে শুধু শুধু তাকিয়ে আছিস।'

জরী শান্ত গলায় বলল, এই মুহূর্তে আমার অন্ধকার দেখতেই ভাল লাগছে।

'ফিলসফারের মত কথা বলছিস যে?'

'আচ্ছা, আর বলব না।'

'চল, তোকে নিয়ে চা খেয়ে আসি '

'জায়গা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছা করছে না।'

'আয় তো তুই।'

জরী উঠল। আনুশকা জরীর হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, চোখ মোছ। তোর চোখে পানি। মুখের হাসি সবাইকে দেখানো যায়, চোখের পানি কাউকে দেখাতে নেই।

'তুই নিজেও তো ফিলসফারের মতো কথা বলছিস।'

'ফিলসফি ছোঁয়াচে রোগের মতো। একজনকে ধরলে সবাইকে ধরে। কিছুক্ষণ পরে দেখবি, আমাদের বল্টুও ফিলসফারের মতো কথা বলা শুরু করবে।'

তারা দুজন একই সঙ্গে বল্টুর দিকে তাকাল। বল্টু বলল, তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

'চা খেতে যাচ্ছি।'

'চলো, আমিও যাব। তোমাদের বডিগার্ড হিসেবে যাব।'

'বল্টু, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি যেখানে বসে আছ সেখানে বসে থাক। নো মুভমেন্ট।'

'বল্টু নামটা না ডাকলে হয় না? আমার সুন্দর একটা নাম আছে — অয়ন।'

আনুশকা বলল, এমন কাব্যিক নাম তোমাকে মানায় না। বল্টু হল তোমার জন্যে সবচে' লাগসই নাম। বল্টু। মিঃ বি।

বুফে কার একেবারে শেষ মাথায়। এদের অনেকক্ষণ হাঁটতে হল। আনুশকা এখনো জরীর হাত ধরে আছে। হাত ধরাধরি করে এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়া বেশ ঝামেলার ব্যাপার, কিন্তু আনুশকা হাত ছাড়ছে না। আনুশকা বলল, জরী, তোর কোন জার্নিটা সবচে' ইন্টারেস্টিং মনে হয়?

'ট্রেন জার্নি।'

'আমারো, কী জন্যে বল তো?'

'চারদিকে দেখতে দেখতে যাওয়া যায়।'

'হয়নি। ট্রেনে চলার সময় ঝিক ঝিক শব্দ হতে থাকে। একধরনের তাল তৈরি হয়, নাচের তাল। এইজন্যেই ভাল লাগে।'

'আমি এইভাবে কখনো ভাবিনি।'

'আমিও ভাবিনি। বাবার কাছে শুনেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে, এটাই বোধহয় ট্রেন জার্নি ভাল লাগার আসল কারণ।'

'কামরায় গাড়িভরা ঘুম, রজনী নিঝুম।'

ট্রেনে উঠলেই আনুশকার এই লাইনগুলো মনে হয়। এখনো মনে হচ্ছে, যদিও কারো চোখেই ঘুম নেই — রজনীও নিঝুম নয়। ট্রেনের শব্দ ছাড়াও আকাশে মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি কি হবে? হলে খুব ভাল হয়। আনুশকা বলল, এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যাবার ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং না?

জরী বলল, হুঁ। সায় দেবার জন্যে সায় দেয়া। সে আসলে কিছু শুনছে না। তার শুনতে ইচ্ছা করছে না। সব মানুষই দিনের কিছু সময় নিজের সঙ্গে কথা বলে। পাশের অতি প্রিয়জনও কী বলছে না বলছে তা কানে যায় না।

আনুশকা বলল, এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাবার ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং কেন বল তো?

'জানি না।'

'প্রতিটি কামরার আলাদা অস্তিত্ব আছে। এক-একটি কামরা পার হচ্ছি, আর মনে হচ্ছে — আমরা আলাদা অস্তিত্ব অতিক্রম করে করে এগুচ্ছি।'

'হুঁ'।

'তুই আমার কথা কিছুই শুনছিস না। মন দিয়ে শুনলে হেসে ফেলতি। কারণ আমি খুব সস্তা ধরনের ফিলসফি করছি।'

'আচ্ছা।'

বুফে কারের ম্যানেজার বলল, কাটলেট আর বোম্বাই টোস্ট ছাড়া কিছু নেই। আনুশকা বলল, কাটলেট এবং বোম্বাই টোস্ট খাবার জন্যে আমরা আসিনি। আমরা চা খেতে এসেছি।

'চা নাই। ওভালটিন আছে।'

'ওভালটিন, ওভালটিন কে খায়? বাংলাদেশ হচ্ছে চায়ের দেশ। এখানে পাওয়া যাবে চা। বিদেশিদের জন্যে কফি। ওভালটিন কেন?'

ম্যানেজার হাই তুলল। জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করল না। ওভালটিন বিক্রি করলে লাভ অনেক বেশি থাকে। এই তথ্য মেয়ে দু'টিকে দেবার তার প্রয়োজন নেই। আনুশকা বলল, ভাই, আপনি এমন বিশ্রী করে হাই তুলবেন না। আমরা চা খেতে এসেছি। চা খাব। আপনি কোত্থেকে জোগাড় করবেন তা আপনার ব্যাপার।

'এগারোটার পর সার্ভিস বন্ধ।'

'বন্ধ সার্ভিস চালু করুন। আমরা ঐ কোণায় বসছি। চা না খেয়ে যাব না। শুনুন, চিনি যেন কম হয়। গাদাখানিক চিনি দিয়ে সরবত বানিয়ে ফেলবেন না।'

ম্যানেজারের কোনো ভাবান্তর হল না। সে আবার হাই তুলল। চলতি ট্রেনে ছোটখাটো ঝামেলা হয়। এসব পাত্তা দিলে চলে না। চা অবশ্য সে সহজেই দিতে পারে। টী-ব্যাগ আছে, গরম পানি আছে। কিন্তু দরকারটা কী? মেয়ে দু'টি খানিকক্ষণ বসে থেকে বিরক্ত হয়ে চলে যাবে। রাগারাগিও হয়তো করবে। করুক-না! অসুবিধা কী?

সুন্দরী মেয়ে রাগারাগি করলেও দেখতে ভাল লাগে। ম্যানেজার মনে মনে অতি কুৎসিত একটা গালি দিল। সুন্দর সুন্দর মেয়েদের এইসব গালি দিতেও লাগে। ওদের শুনিয়ে গালিটা দিতে পারলে হয়তো আরো ভাল লাগত। সেটা সম্ভব না।

জরী এবং আনুশকা মুখোমুখি বসেছে। জানালা খোলা। খোলা জানালায় হুহু করে হাওয়া আসছে। এদের শাড়ির আঁচল পতাকার মতো পতপত করে উড়ছে। আনুশকা বলল, কী বাতাস দেখেছিস?

'হুঁ'।

'আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ — দারুণ বৃষ্টি হবে। ঝমঝমিয়ে একটা বৃষ্টি দরকার। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলেই তোর মনের মেঘ কেটে যাবে।'

'মন বিশেষজ্ঞ হলি কবে থেকে?'

'অনেক দিন থেকে। আমি নিজেই রোগি, নিজেই ডাক্তার। আমার নিজের মন কীভাবে খারাপ হয়, কীভাবে ভাল হয়, তা আমি মনিটার করি। মনিটার করতে করতে আমার এখন একধরনের ক্ষমতা হয়েছে। মন ভাল করার কৌশল আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না।'

'বৃষ্টি নামলেই আমার মন ভাল হয়ে যাবে?'

'ইয়েস ম্যাডাম।'

'তোর মন হয়তো ভাল হবে। কিন্তু সবার মন তো আর তোর মতো না। আমরা সবাই আলাদা আলাদা।'

'আলাদা হলেও এক ধরনের মিল আছে। দুঃখ পেলে সবারই মন-খারাপ হয়। সবাই কাঁদে। কেউ শব্দ করে, কেউ নিঃশব্দে।'

জরী ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সবাই যে কাঁদে তা কিন্তু না, কেউ কেউ হেসেও ফেলে।

আনুশকা চুপ করে গেল। জরী বলল, চা কিন্তু এখনো দেয়নি। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে সে দেবে না। দেখ দেখ, কী বিশ্রী করে তাকাচ্ছে!

আনুশকা বলল, কী ব্যাপার, এখনো যে চা আসছে না?

ম্যানেজার বলল, একবার তো বলেছি এগারোটা বাজে, সব বন্ধ।

'আমরা কিন্তু চা না খেয়ে যাব না।'

ম্যানেজার মনে মনে তার প্রিয় গালটা দিল। আফসোস, এরা শুনতে পাচ্ছে না। শুনতে পেলে দৌড়ে পালিয়ে যেত। সে যেখানে বসেছে সেখান থেকে মেয়ে দু'টিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তাতে অসুবিধা নেই। পেছন দিক থেকে একজনের পেটের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ফর্সা পেট দেখতে ভাল লাগছে। এখান থেকে অনুমান করা যায় গোটা শরীরটা কেমন।

আনুশকা ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, কী, চা দেবেন না?

ম্যানেজার বলল, না।

আনুশকা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'না' শব্দটা শুনতে কী খারাপ লাগে লক্ষ করেছিস জরী? অথচ এই শব্দটাই আমরা সবচে' বেশি শুনি।

'আমরা নিজেরাও প্রচুর বলি।'

'আমি বলি না। আমি সব সময় "হ্যাঁ" বলার চেষ্টা করি।'

'সবার সাহস তো তোর মতো না।'

আনুশকা বলল, আমি আসলে কিন্তু ভীতু ধরনের একটি মেয়ে। সবসময় সাহসী মুখোশ পরে থাকি। আমাদের মধ্যে সত্যিকার সাহসী যদি কেউ থাকে, সে হল তুই নিজে।

'আমাকে সাহসী বলছিস কেন?'

'বিয়ের আসর থেকে তুই পালিয়ে এসেছিস। তোর গায়ে এখনো বেনারসী শাড়ি। ক'টা মেয়ে এই কাজ পারবে?'

'কাজটা কী আমি ঠিক করেছি?'

'তা তো আমি বলতে পারব না। তুই বলতে পারবি। আমি বাইরে থেকে তোর ব্যাপারে কি মতামত দেব?'

'যে ছেলেটার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছিল সেই ছেলেটা ভাল না, মন্দ ছেলে।'

'মানুষের ভাল-মন্দ চট করে বোঝা যায় না। তোর সঙ্গে তো ছেলেটার পরিচয়ই হয়নি। তুই বুঝলি কী করে সে মন্দ?'

'বিয়রে দু'দিন আগে সে আমাকে একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িতে করে যাচ্ছি, হঠাৎ সে আমার গায়ে হাত দেয়। ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। আমরা পেছনের সীটে।'

'গায়ে হাত দেয় মানে কী? হাতে হাত রাখে? যে ছেলে জানে দু'দিন পর তোর সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে, সে অবশ্যই তোর হাতে হাত রাখতে পারে। আমি তাতে কোনো সমস্যা দেখি না।'

'হাতে হাত রাখা নয়। অন্য ব্যাপার, কুৎসিত ব্যাপার। আমি মুখে বলতে পারব না। এবং এই ব্যাপারটা ড্রাইভারের সামনে ঘটে। ড্রাইভার গাড়ির ব্যাক-ভিউ মিররে পুরো ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছিল। সে ছিল নির্বিকার, কারণ এ-জাতীয় ঘটনা এই গাড়িতে আরও ঘটেছে। এটা ড্রাইভারের কাছে নতুন কিছু ছিল না।'

'তুই তখন কী করলি?'

'কঠিন গলায় ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। তারপর গাড়ির দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম।'

'কী ঘটেছিল বাসার সবাইকে বললি?'

'হ্যাঁ, বিয়ে ভেঙে দেয়ার জন্য আমি আমার বড় চাচার পা পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে কাঁদলাম। বড় চাচা রাজি হলেন না, কারণ ছেলের নাকি মস্তানদের সঙ্গে ভাল কানেকশন। এরকম কিছু করলে ভয়ংকর ক্ষতি হবে।'

'জেনেশুনে তোর বড় চাচা এমন একজন ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক করলেন?'

'হ্যাঁ, করলেন। কারণ ঐ ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে চাচার ব্যবসার সুবিধা হয়।'

'বিয়ের আসর থেকে তুই পালিয়ে এলি কীভাবে?'

'বড় চাচী ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে বসে ছিলাম। বড় চাচী পালিয়ে যেতে বললেন।'

'আগে তো শুনেছিলাম, তোর এই চাচী তোকে দেখতে পারে না।'

'মানুষকে চট করে চেনা যায় না, আনুশকা। এই চাচী আমাকে সত্যি সত্যি অপছন্দ করতেন। সারাক্ষণ কঠিন সব অপমান করতেন। আমরা যে তাঁর বাড়ির আশ্রিত অন্নদাস এই কথা দিনের মধ্যে খুব কম হলেও দশবার মনে করিয়ে দিতেন। অথচ এই তিনিই আমার চরম দুঃসময়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমার মা আমার পাশে এসে দাঁড়াল না, আমার বাবাও না। কে পাশে এসে দাঁড়াল? আমার বড় চাচী।'

আনুশকা বলল, চার ব্যাপারটা মন থেকে তাড়াতে পারছি না। মনে হচ্ছে, এক কাপ চা খেতে না পারলে মরে যাব। কী করা যায় বল তো?

জরী বলল, এখন আর শুধু একটা জিনিসই করা যেতে পারে। ঐ লোকটার পায়ে ধরা। সেটা কি ঠিক হবে? সামান্য এক কাপ চায়ের জন্যে পা ধরা? তাও যদি সুন্দর পা হত একটা কথা ছিল।

আনুশকা অন্যমনস্ক গলায় বলল, "পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা" — এই দু'টা লাইন রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পে আছে বল তো?

'জানি না। বলতে পারব না। হঠাৎ কবিতার লাইন কেন?'

অনুশকা বলল, তোর পায়ে ধরার কথা থেকে মনে এল। আমাদের মন বিচিত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছোটাছুটি করে।

'গল্পগুচ্ছে আছে জানি, কিন্তু কোন গল্প মনে পড়ছে না। আমার কিছু মনে না এলে খুব অস্থির লাগে। মাথায় চাপা যন্ত্রণা হয়। আমার ইচ্ছা করছে ডেকে ডেকে সবাইকে জিজ্ঞেস করি।'

'হ্যালো ম্যানেজার সাহেব, বলুন তো "পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা" — এই লাইন দুটো রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের কোন গল্পে আছে?'

ম্যানেজার কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। জরী বলল, শুভ্র বলতে পারবে। যদি কেউ জানে শুভ্র জানবে।

শুভ্র শুকনো মুখে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেট ধরানোর অস্বস্তিতে সে প্রায় মরে যাচ্ছে। মোতালেবের চাপাচাপিতে এটা করতে হয়েছে। মোতালেব হুঙ্কার দিয়ে

বলেছে — খাবি না মানে? খেতে হবে। গুড বয় হয়ে অনেক দিন পার করেছিস। আর না। এখন আমরা ব্যাড বয় হব।

'ব্যাড বয় হলে সিগারেট খেতে হবে?'

'অবশ্যই খেতে হবে। সিগারেট খেতে হবে। গাঁজা খেতে হবে। শার্টের বুকের বোতাম খোলা রাখতে হবে। মেয়েরা আশেপাশে থাকলে অশ্লীল রসিকতা করতে হবে। খোল, শার্টের বুকের বোতাম খোল, যাতে বুকের লোম দেখা যায়। তোর বুকে লোম আছে?'

শুভ্রর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। মোতালেব বলল, লজ্জায় তুই দেখি টমেটোর মতো হয়ে গেছিস। ফুসফুস ভর্তি করে সিগারেটের ধোঁয়া নে, দেখবি লজ্জা কেটে যাবে। লাজুক মানুষ এইজন্যেই সিগারেট বেশি খায়। লজ্জা ঢাকার জন্যে খায়। গাঁজা খেলে কী হয় জানিস?

'না।'

'লজ্জা বেড়ে যায়। গাঁজা হল লজ্জাবর্ধক। বিরাট বডিবিল্ডারও দেখবি গাঁজার কল্কেতে টান দিয়ে মিহি মেয়েলি গলায় কথা বলবে। গাঁজার অন্য মজা।'

শুভ্র বলল, তুই গাঁজা খেয়েছিস?

'অবশ্যই খেয়েছি। গাঁজা খেয়েছি। কালিপূজার সময় ভাং-এর যে সরবত করে তাও খেয়েছি। ভাং-এর সরবত খেলে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়। কী হয় শুনতে চাস?'

'চাই।'

'এই তো পথে আসছিস। আমার ধারণা ছিল তুই বলবি, শুনতে চাই না। দাঁড়া, তোকে বলব কী হয়। তার আগে জরী আর আনুশকাকে নিয়ে আসি। ওরা কোথায়?'

'চা খেতে গিয়েছে বুফে কারে।'

'চল, ওদের নিয়ে আসি। ভাং খেলে কী হয় এটা শুনলে মেয়েরা খুব মজা পায়। এটা বলতে হবে মেয়েদের সামনে।

শুভ্রর খেতে ইচ্ছা করছে না। সিগারেট হাতে নিয়ে হাঁটতে লজ্জা-লজ্জা লাগছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, সে কোনো অপরাধ করে ফেলেছে এবং মা পরিষ্কার দেখছেন। এক্ষুনি যেন তিনি বলবেন, শুভ্র বাবা, তেমার হাতে কী?

মোতালেব বলল, সবাই মিলে ছাদে বসে যেতে পারলে ইন্টারেস্টিং হত। ট্রেনের ছাদে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকলে দারুণ লাগে।

শুভ্র বলল, ভয় লাগে না?

'প্রথম দু'-তিন মিনিট ভয় লাগে। তারপর আর লাগে না।'

আনুশকা ওদের দেখেই বলল, ঐ ম্যানেজার আমাদের চা দিচ্ছে না। আধ ঘণ্টার মতো বসে আছি। একটু বলে দেখো না।

মোতালেব বলল, তোমার মতো রূপবতীকে চা দেয়নি, আমাকে দেবে? হাতি ঘোড়া গেল তল, মোতালেব বলে কত জল?

'তোমার তো অনেক টেকনিক আছে।'

'আচ্ছা দেখি। একটা নিউ টেকনিক অ্যাপ্লাই করে দেখি। শুভ্র, তুই আয় আমার সঙ্গে। এই টেকনিকে ম্যান পাওয়ার লাগে।'

শুভ্র বাধ্য ছেলের মতো রওনা হল। সে ভেবেছিল, তার হাতে সিগারেট দেখে জরী বা আনুশকা কিছু বলবে। তারা কিছু বলেনি। শুধু জরী সিগারেটের দিকে তাকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসেছে। বাচ্চা ছেলে বাবার জুতায় পা ঢুকিয়ে হাঁটার চেষ্টা করলে মা'রা যেমন ভঙ্গিতে হাসে অনেকটা সেই ভঙ্গির হাসি।

মোতালেব কাঁচুমাচু মুখে ম্যানেজারকে বলল, ভাইজান, রূপবতী দুই মহিলা আধ ঘণ্টার উপর বসে আছে। এদের চা দিচ্ছেন না কেন?

'বুফে কার বন্ধ।'

'এখানে আসার পথে দেখলাম, টী-পটে চা নিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের দিকে যাচ্ছে।'

'আগে অর্ডার ছিল।'

'ভাই, আমরা গল্পগুজব করতে করতে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি। দেন না। দশটা টাকা নাহয় বেশি রাখেন। নো প্রবলেম।'

'বললাম তো, হবে না।'

'এরা আমাদের দু'জনকে আশা করে পাঠিয়েছে। এর নাম শুভ্র। অতি ভাল ছেলে। শুভ্রর প্রেস্টিজের একটা ব্যাপারও আছে। চা নিয়ে যেতে না পারলে মেয়েগুলির সামনে শুভ্রর মান থাকবে না।'

'এক কথা কয়বার বলব? আপনারা কেন বিরক্ত করছেন?'

'তা হলে কি এদের নিয়ে উঠে চলে যাব?'

'সেটা আপনার ইচ্ছা।'

'ভাইজান, আমরা কিন্তু মানুষ ভাল না। এখন আমরা দুইজন আপনার গায়ে থুথু দেব। থু করে একদলা থুথু ফেলব।'

হতভম্ব ম্যানেজার বলল, কি বললেন?

'আপনার গায়ে থুথু ফেলব।'

'ফাজলামি করছেন নাকি?'

'জ্বি না ব্রাদার, ফাজলামি করছি না। শুভ্র, এর গায়ে থুথু ফেল তো।'

শুভ্র সঙ্গে সঙ্গে থু করে থু থু ফেলল। এবং থুথু ফেলে তার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা রইল না। এটা সে কি করল? কীভাবে করতে পারল?

ম্যানেজার লোকটা কী অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে!

শুভ্র করুণ চোখে তাকাল মোতালেবের দিকে।

মোতালেব সহজ গলায় বলল, এখন আমরা যাই। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে যাই। আরো পনেরো মিনিট অপেক্ষা করব। পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি চা না আসে তা হলে ট্রেনের দরজা খুলে ধাক্কা দিয়ে তোকে নিচে ফেলে দেব। আমার ভাল নাম মোতালেব। বন্ধুরা বলে মোতা মিয়া। একবার এক পাজীর গায়ে পিসাব করে দিয়েছিলাম। সেই থেকে মোতা মিয়া নাম।

মোতালেবরা জরীদের কাছে ফিরে গেল। জরী বলল, চা আসছে?

মোতালেব বলল, বুঝতে পারছি না। তবে সম্ভাবনা আছে। অষুধ দিয়ে এসেছি। অষুধে কাজ হবে কি না জানি না। হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আবার উল্টা অ্যাকশানও হতে পারে।

'অষুধটা কী?'

'মাইল্ড ডোজের সালফা ড্রাগ দেয়া হয়েছে। সালফা ড্রাগে কাজ না হলে অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হবে। ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক।'

জরী বলল, শুভ্রর মুখটা এমন মলিন লাগছে কেন? কী হয়েছে শুভ্র?

শুভ্র জবাব দিল না। চোখ নিচে নামিয়ে নিল। লজ্জায় সে মাথা তুলতে পারছে না।

আনুশকা বলল, আচ্ছা শুভ্র, এই লাইন দু'টা কোথায় আছে বলতে পারবে?

"পায়ে ধরে সাধা
রা নাহি দেয় রাধা।"

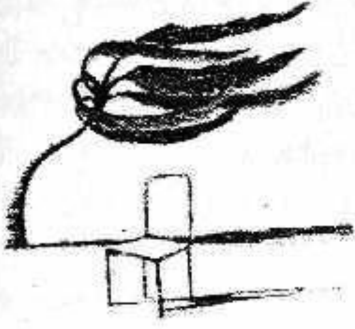
শুভ্র ক্ষীণ গলায় বলল, গল্পগুচ্ছে আছে।

'গল্পের নাম কী?'

'গুপ্তধন।'

'Thank you learned কানাবাবা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।'

প্রশংসাবাক্যেও শুভ্রের কিছু হল না। তার মুখ মলিন হয়েই রইল। তার শুধু মনে হচ্ছে, যদি কোনোদিন মা এই ঘটনা জানতে পারেন তার কেমন লাগবে? মা অবশ্যই জানতে চাইবেন সে কেমন করে এই কাজটা সে করল? তখন সে কী বলবে? কিংবা মা হয়তো কিছুই জানতে চাইবেন না। শুধু শান্ত চোখে তাকিয়ে থাকবেন। সে তো আরো ভয়াবহ।



শুভ্রর মা রাহেলার ব্লাডপ্রেশার হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে দাঁত মাজছিলেন, হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠল। তিনি দেয়াল ধরে টাল সামলালেন। এরকম অবস্থায় কোথাও বসে যাওয়া উচিত। আশেপাশে বসার কিছু নেই। বসতে হলে মেঝেতে বসতে হয়। রাহেলা ক্ষীণ স্বরে ডাকলেন, মধুর মা, মধুর মা!

মধুর মা একতলায় ছিল। রাহেলার গলার স্বর এতদূর পৌঁছানোর কথা না, কিন্তু মধুর মার কান খুব পরিষ্কার। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল। রাহেলা প্রায় ফিসফিস করে বললেন, বেতের চেয়ারটা এনে দাও। বসব। আমার মাথা ঘুরছে।

মধুর মা বেতের চেয়ার এনে দিল।

'বরফ মিশিয়ে আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দাও।'

'শরীর বেশি খারাপ আম্মা? ডাক্তার খবর দিব।?'

'ডাক্তার লাগবে না। শুভ্রের ঘরে বাতি জ্বলছে কেন? বাতি জ্বালাল কে? যাও, বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে আসো। পানি পরে আনবে।'

'দরজায় তালা দিমু আম্মা?'

'হ্যাঁ, তালা দাও।'

মধুর মা শুভ্রের ঘরে ঢুকল। রাহেলা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। শুভ্রের ঘরে কেউ ঢুকলে তাঁর ভাল লাগে না। শুভ্র বাড়ি ছেড়ে গেছে তিন ঘণ্টাও হয়নি। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে অনন্তকাল পার হয়ে গেছে। এই প্রথম শুভ্রের বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাওয়া। শুভ্র আর দশটা ছেলের মতো হলে তিনি এতটা বিচলিত হতেন না। সে আর দশটা ছেলের মতো নয়। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললে সে কিছুই দেখে না। একজনকে সারাক্ষণ তার চশমা খুঁজে দিতে হয়। তার ওপর শুভ্রের চশমা-ভাঙা রোগ আছে। অকারণে হোঁচট খেয়ে পড়ে চশমা ভেঙে ফেলবে। তিনি অবশ্যি শুভ্রের ব্যাগে দু'টি বাড়তি চশমা দিয়ে দিয়েছেন। প্রয়োজনের সময় সেই চশমা দুটি শুভ্র কি খুঁজে পাবে?

মধুর মা গ্লাসে করে হিম-শীতল পানি নিয়ে এল। এক চুমুক পানি খেয়েই

রাহেলার মনে হল, তাঁর আসলে পিপাসা পায়নি। রাহেলা বললেন, মজিদ কি এসেছে মধুর মা?

'জ্বি আসছে।'

'কতক্ষণ হল এসেছে?'

'অনেকক্ষণ।'

'আমাকে বলনি কেন?'

রাহেলা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথা অবশ্যি এখনো ঘুরছে। আজ সকালে ব্লাড-প্রেশারের ওষুধ কি তিনি খেয়েছেন? রাহেলা মনে করতে পারলেন না। মজিদকে পাঠাতে হবে ডাক্তার সাহেবকে আনার জন্যে। রাহেলার এক দূর সম্পর্কের চাচা তাঁর ডাক্তার। ওঁর বাসায় টেলিফোন নেই, খবর দিতে কাউকে পাঠাতে হয়।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মজিদ খুক খুক করে কাশল। রাহেলা বললেন, মজিদ, তুমি কখন এসেছ?

'অনেকক্ষণ হইল আসছি।'

'খবর দাওনি কেন?'

মজিদ অন্যদিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাচ্ছে। এ বাড়ির সবক'টা কাজের মানুষ এমন গাধা কেন? মজিদকে স্টেশনে পাঠানো হয়েছিল দূর থেকে দেখার জন্যে শুভ্র ঠিকমত ট্রেনে উঠতে পারল কি না। এই খবর সে বাসায় এসে দেবে না?

'শুভ্র কি ট্রেনে ঠিকমত উঠেছে?'

'জ্বি আম্মা।'

'ওর বন্ধুরা সব ছিল?'

'জ্বি, ছিল।'

'শুভ্র তোমাকে দেখতে পায়নি তো?'

'জ্বি না। ছোট ভাইজানের চোখে চশমা ছিল না।'

রাহেলা হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই গাধা কী বলছে! চোখে চশমা ছিল না মানে কী? গাধাটা কি জানে না, চশমা ছাড়া শুভ্র অন্ধ? নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ ভঙ্গিতে রাহেলা বললেন, চোখে চশমা ছিল না?

'জ্বি না।'

'চশমা ছাড়া সে ট্রেনে গিয়ে উঠল কীভাবে?'

'একজন সুন্দরমত আপা উনার হাত ধইরা ট্রেইনে নিয়ে তুলছেন।'

'তুমি জিজ্ঞেস করনি, আপনার চশমা কোথায়?

'জ্বি না। আপনে বলছেন দূর থাইক্যা দেখতে।'

গাধাটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। রাহেলা দোতলায় উঠে এলেন। এইটুক সিঁড়ি ভাঙতেই তাঁর দম আটকে আসছে। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যাবেন। মধুর মাকে দিয়ে খবর পাঠালেন যেন ডাক্তার আনা হয়। ঘড়ি দেখলেন, শুভ্রর বাবার আসার সময় হয়েছে। তাঁর সঙ্গে কথা বললে রাহেলার মনের অস্থিরতা কিছুটা কমবে। মানুষটা হয়ত যুক্তি দিয়ে বোঝাবে, চশমা ছাড়া শুভ্রের তেমন অসুবিধা হবে না। কিংবা কোনো ব্যবস্থা করবে যেন ট্রেনেই শুভ্র চশমা পেয়ে যায়। 'সুন্দরমত একজন আপা শুভ্রের হাত ধরে টেনে তুলেছে।' সেই সুন্দরমত আপাটা কে? শুভ্রের কোনো মেয়েবন্ধু আছে বলে তিনি জানেন না। এ বাড়িতে মেয়েরা কখনো আসেনি। কারো সঙ্গে ভাব থাকলে শুভ্র নিশ্চয়ই তাকে এ বাড়িতে আসতে বলত। রাহেলার খুব শরীর খারাপ লাগছে। আবার পিপাসা হচ্ছে। হাত কাঁপছে।

শুভ্রর বাবা বাড়ি ফিরলেন রাত বারোটা দশ মিনিটে। এত রাতে তিনি কখনো বাড়ি ফিরেন না। তাঁর টঙ্গী সিরামিক্স কারখানার সমস্যা হচ্ছে বলে গত কয়েক রাত ফিরতে দেরি হচ্ছে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব দোতলায় উঠে দেখলেন, শুভ্রর ঘরে বাতি জ্বলছে। তিনি বিস্মিত হয়ে উঁকি দিলেন। শুভ্রের বিছানায় রাহেলা পা তুলে বসে আছেন। রাহেলার মাথার চুল ভেজা। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই মাথায় পানি ঢালা হয়েছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, কী ব্যাপার?

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, শুভ্র তার চশমা হারিয়ে ফেলেছে।

'শুভ্রের কথা জানতে চাচ্ছি না। তোমার কী হয়েছে?'

'আমার খুব অস্থির লাগছে।'

'প্রেশার বেড়েছে?'

'হুঁ।'

'ডাক্তার এসেছিল?'

'হু'।

'প্রেসার এখন কত?'

'উনি বলেননি। অষুধ খেতে দিয়েছেন।'

'খেয়েছ?'

'হুঁ'।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব চেয়ার টেনে রাহেলার মুখোমুখি বসলেন।

'ভাত খেয়েছ রাহেলা?'

'না।'

'উঠে খাবার দিতে বলো। আমি গোসল করে চারটা খাব। খাবার টেবিলে কথা হবে। শুভ্রের চশমার ব্যাপারে এত চিন্তিত হবার কিছু দেখছি না। তুমি কি ওকে বাড়তি চশমা দাওনি?'

'ওর হ্যান্ডব্যাগে দু'টা আছে। কিন্তু ওকে তো বলা হয়নি।'

'না বললেও অসুবিধ হবে না। একসময়-না এক-সময় ও ব্যাগ খুলবে। ব্যাগ খুললেই পেয়ে যাবে।'

রাহেলা ফিসফিস করে বললেন, যদি ব্যাগটা হারিয়ে ফেলে? চোখে তো এখন দেখছে না। নিজের ব্যাগ চিনবে কী করে?

ইয়াজউদ্দিন সাহেব ধৈর্য হারালেন না। শান্ত গলায় বললেন, চিটাগাং নেমে নতুন চশমা বানিয়ে নেবে। প্রেসক্রিপশন সবসময় শুভ্রর মানিব্যাগে থাকে। থাকে না?'

'হুঁ।'

'নামো তো বিছানা থেকে। নামো।'

'আমার খুব অস্থির লাগছে।'

'শোনো রাহেলা, আমি বরং এক কাজ করি। আমাদের চিটাগাং অফিসের সিদ্দিককে বলে দিই, সে ভোরবেলা চিটাগাং রেল স্টেশনে যাবে এবং শুভ্রকে বলবে, তার হ্যান্ডব্যাগের সাইড পকেটে চশমা আছে।'

'আচ্ছা।'

'তোমার অস্থিরতা কি এখন একটু কমেছে?'

রাহেলা জবাব দিলেন না। ইয়াজউদ্দিন সাহেব শান্ত গলায় বললেন, আমি ট্রেনে একজন লোক রেখেছি। সে সবসময় শুভ্রের উপর লক্ষ রাখবে। তোমাকে এই খবরটা জানাতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু প্রেশার-ট্রেশার বেড়ে তোমার যা অবস্থা হয়েছে, আমার মনে হল জানানো উচিত।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর হাত ধরে তাঁকে নিচে নামালেন। রাহেলা বললেন, মজিদ বলছিল, সুন্দরমত একটা মেয়ে নাকি শুভ্রের হাত ধরে তাকে ট্রেনে নিয়ে তুলছে।

'ভালই তো। সমস্যার সময়ে বন্ধুর মতো কাউকে কাছে পাচ্ছে।'

'আমার কেন জানি খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু ঘটবে।'

'ভয়ংকর কিছুটা কী হবে বলে মনে করছ?'

'ওরা সমুদ্রে নামবে, তারপর চোরাবালিতে আটকে যাবে।'

'ও তো একা যাচ্ছে না। ওর আট-ন'জন বন্ধু আছে। একজন চোরাবালিতে

আটকালে অন্যরা টেনে তুলবে।'

'বিপদের সময় কাউকে কাছে পাওয়া যায় না।'

'ঐ মেয়েটিকে পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা।'

'কোন মেয়ে?'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, সুন্দরমত মেয়েটি। যে শুভ্রর হাত ধরে তাকে ট্রেনে তুলে নিল। তুমি এখনো এত অস্থির হয়ে আছ কেন? যাও, নিচে গিয়ে খাবার গরম করতে বল। আমি চিটাগাং টেলিফোন করছি।

'ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে আমিও কথা বলব।'

'তোমার কথা বলার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। যা বলার আমি গুছিয়ে বলব।'

'চশমাটা আছে ওর হ্যান্ডব্যাগের ডান দিকের পকেটে। ডিসপোসেবল রেজার, শেভিং ক্রীম, সাবান, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ সব আছে বাঁ দিকের পকেটে।'

'আমি বলে দেব।'

রাহেলা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, শুভ্রর জন্যে আমার এই যে ভীতি, তোমার কাছে তা কি অস্বাভাবিক মনে হয়?

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, না। অন্য সবার কাছে মনে হবে তুমি বাড়াবাড়ি করছ। কিন্তু আমার কাছে মনে হবে, না। কারণ অন্যরা জানে না, কিন্তু আমরা জানি, শুভ্রর চোখের নার্ভ শুকিয়ে আসছে। অতি দ্রুত তার চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। সে কিছুই দেখবে না।

রাহেলা থমথমে গলায় বললেন, বারবার তুমি এই কথা মনে করিয়ে দাও কেন?

'তোমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্যেই করি। বড় ধরনের ক্যালামিটির জন্যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার। মানসিক প্রস্তুতি থাকে না বলেই আমরা কোনো বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না।'

'তুমি পার?'

'হ্যাঁ, আমি পারি।'

রাহেলার মাথা ঘুরে উঠল। তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন, আমার কেমন জানি লাগছে!

ইয়াজউদ্দিন রাহেলার হাত ধরে ফেললেন। ঠাণ্ডা হাত। সেই হাত থরথর করে কাঁপছে।



রাত বাজে দু'টার মতো।

কথা ছিল সারা রাত সবাই জেগে থাকবে। হৈচৈ করতে করতে যাবে। মনে হচ্ছে সবার উৎসাহে ভাটা পড়েছে। বল্টু গোড়া থেকেই মনমরা ছিল। তার মনমরা ভাব রাত একটার দিকে কাটল। সে মোতালেবের কাছ থেকে ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে ফুল ভল্যুমে ক্যাসেট চালু করল। বন্যার রবীন্দ্রসংগীত। তবে ক্যাসেটে দোষ আছে। মনে হচ্ছে বন্যার গলায় ল্যারিনজাইটিস। ভাঙা গলায় গান, —

সখী বয়ে গেল বেলা
শুধু হাসি খেলা আর কি ভাল লাগে?

চশমাপরা দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক হঠাৎ পেছন থেকে উঠে এসে কঠিন গলায় বললেন, আপনি কি গান বন্ধ করবেন?

বল্টু বলল, কেন বন্ধ করব?

'বন্ধ করবেন, কারণ, রাত দু'টা বাজে। এখন গানের সময় না। এখন ঘুমুবার সময়।'

'আপনার জন্যে ঘুমুবার সময়। আপনি কোলবালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমাদের এখন জেগে থাকার সময়।'

চশমাওয়ালা লোক সমর্থনের আশায় চারদিকে তাকাচ্ছে। কাজেই সমর্থন পাবার আগেই বল্টুকে সাপোর্ট দেবার জন্যে মোতালেব বলল, গানের পরেপরেই আছে নৃত্যানুষ্ঠান। আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। আমাদের দলে কয়েকজন নৃত্যশিল্পী আছেন। নইমা, নাচের জন্যে তৈরি হও।

নইমার জন্যে অত্যন্ত অপমানসূচক কথা। তার বিশাল শরীরের দিকে লক্ষ্য করেই তাকে নৃত্যশিল্পী বলা হচ্ছে। অতিবড় বোকাও এটা বুঝবে। নইমার পাশে নীরা বসেছিল। সে খিলখিল করে হাসতে শুরু করেছে, যেন এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রসিকতাটা সে এইমাত্র শুনল।

চশমাপরা ভদ্রলোক বললেন, আপনারা আমাদের সারা রাত বিরক্ত করবেন, তা তো হয় না।

বল্টু বলল, প্রতিরাতেই যে ঘুমতে হবে তার কি কোনো মানে আছে? একটা রাত না ঘুমিয়ে দেখুন কেমন লাগে। খারাপ লাগবে না।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে রানা উঠে বলল, নো মিউজিক। গান বন্ধ। অন্য যাত্রীদের সুবিধা–অসুবিধাও আমাদের দেখতে হবে।

সে চশমাপরা লোকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, ওল্ড ব্রাদার, নো অফেন্স। যান, শুয়ে পড়ুন।

মোতালেবের গা জ্বলে গেল। ট্রেন ছাড়ার পর থেকেই রানা এই আলগা মাতব্বরিটা করছে। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। কষে এর পাছায় একটা লাথি বসিয়ে দেয়া দরকার। লোকজনের সামনেই দেয়া দরকার, যাতে গাধাটার একটা শিক্ষা হয়। মাতব্বর!

মুনা জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখছিল। অন্ধকারে দেখার কিছু নেই, তবু ভাল লাগছিল। ভাল বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিও দেখা যাচ্ছে না। তবে বৃষ্টির শব্দ শুনতে খুব সুন্দর লাগছে। চলন্ত ট্রেন থেকে বৃষ্টির শব্দ যে এত সুন্দর লাগে কে জানত?

রানা এসে খট করে মুনার জানালা বন্ধ করে বলল, নো বৃষ্টিতে ভিজাভিজি। ঘুমা। ঘুমিয়ে পড়।

রানা এসে বসল সঞ্জুর পাশে। সঞ্জুকে খুব মনমরা লাগছে। দলের কেউ কোনো কারণে বিষণ্ন হলে সেটা দেখার দায়িত্বও তার।

'কী হয়েছে রে সঞ্জু?'

'কই, কিছু হয়নি তো।'

'মন–খারাপ করে বসে আছিস কেন? কী হয়েছে বল।'

'কিছু হয়নি।'

'মুনা লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছে এইজন্যে মন খারাপ? বাদ দে, বাচ্চা মেয়ে মিসটেক করে ফেলেছে। হেভি বকা দিয়ে দিয়েছি। তুই যদি মুখ ভোঁতা করে রাখিস তা–হলে মুনা ভাববে তার জন্যে তোর মন–খারাপ। এই কাজটা সে করল কী করে তাই আমি এখনো বুঝতে পারছি না। এমন তো না যে বেকুব মেয়ে . . . নে সঞ্জু, সিগারেট নে।'

সঞ্জু সিগারেট নিল। মুনা কী জন্যে লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠেছে তা সে না জানলেও অনুমান করতে পারছে। মুনার জন্যে তার খুব মায়া লাগছে।

'বি হ্যাপি সঞ্জু, বি হ্যাপি। মন–খারাপ করে থাকবি না। আমি যাই, টিটির সঙ্গে ম্যানেজ করে আসি। টাকা খাইয়ে আসি।'

'টাকা খাওয়াবি কেন?'

'আমাদের মধ্যে দু'জন আছে না — টিকেট ছাড়া? টাকা না খাওয়ালে হবে কী ভাবে? আমি অবশ্যি প্রিলিমিনারি আলাপ করে রেখেছি। চোখ-টিপি দিয়ে দিয়েছি। এইসব লক্ষ রাখতে হবে না? নয়তো চিটাগাং নামতেই ঝামেলায় পড়ে যেতাম। আমি ম্যানেজ না করলে এতসব ঝামেলা তোরা মেটাবি কী করে? তোর তো আবার সব ভদ্রলোক। এই দেখ-না, বৃষ্টি হচ্ছে অথচ সবার জানালা খোলা। ঠাণ্ডা লেগে বুকে কফ বসে গেলে অবস্থাটা কী হবে? কোথায় পাব ডাক্তার? কোথায় পাব অষুধ?'

রানা ব্যস্ত পায়ে উঠে চলে গেল। রানা চলে যেতেই মুনা আবার তার জানালা খুলে দিল। জানালা খোলার সময় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। সঞ্জুও হাসল।

ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে।

জরীর পাশের জানালা খোলা। বৃষ্টির ছাট আসছে। আনুশকা বলল, জরী, তুই ভিজে যাচ্ছিস। জানালা বন্ধ করে দে।

জরী বলল, আমার ভিজতে ভাল লাগছে।

'অসুখ বাধাবি। নিউমোনিয়া হবে। আমাদের সব প্রোগ্রাম বানচাল হবে।'

'সেটাও মন্দ না। মানুষের জীবনে প্রোগ্রাম ছাড়া কিছু কিছু অংশ থাকা দরকার। যে অংশে আগেভাগে কিছু ভাবা হবে না — যা হবার হবে।'

আনুশকা হাসিমুখে বলল, এটা কি কোনো দার্শনিক তত্ত্ব?

'খুবই সাধারণ তত্ত্ব। দার্শনিক-ফার্শনিক না।'

'জরী, তুই কিন্তু ভিজে ন্যাতা-ন্যাতা হয়ে গেছিস।'

জরী হালকা গলায় বলল, তুই একটা প্রসঙ্গ নিয়ে এত কথা বলিস যে, রাগ লাগে। কথা বলার তো আরো বিষয় আছে।

'আচ্ছা যা, এই প্রসঙ্গে আর কথা বলব না। শুভ্রকে দেখছি না কেন রে জরী? শুভ্র কোথায় গেল?'

'যাবে আবার কোথায়? ট্রেনেই আছে। মনে হয় এক কামরা থেকে আরেক কামরায় সিগারেট হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'ওর এমন একা ঘুরে বেড়ানো ঠিক না। চোখে কম দেখে।'

জরী হেসে ফেলল। আনুশকা বলল, হাসছিস কেন?

'তোর মাতৃভাব দেখে হাসছি। তোর মধ্যে একটা দলপতি-দলপতি ব্যাপার আছে। সব সময় লক্ষ করেছি, আমরা কোথাও গেলেই তুই দলপতি সেজে

ফেলিস। সব চিন্তা-ভাবনা নিজের মাথায়। আমাকে নিয়ে ভাবছিস, আবার শুভ্রকে নিয়ে ভাবছিস। এত কিসের ভাবাভাবি? আমরা সবাই রাজা।'

'আচ্ছা যা, আর ভাবব না।'

'না ভেবে তুই পারবি না। ব্যাপারটা রক্তের মধ্যে ঢুকে আছে।'

আনুশকা বলল, জানালা পুরোটা খোলা না রেখে হাফ খুলে রাখ। তুই একেবারে গোসল করে ফেলেছিস।

জরী জানালা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। আনুশকা বলল, যাচ্ছিস কোথায়?

'অন্য কোথাও গিয়ে বসব। যেখানে আমার মাতৃসম কেউ থাকবে না। কেউ আমাকে ক্রমাগত উপদেশ দেবে না।'

'স্যরি। এখানেই বোস। জানালা পুরোপুরি খুলে দে। আমি আর কিছু বলব না। ওয়ার্ড অব অনার।'

'না, তোর পাশে বসব না।'

জরী হাঁটতে শুরু করল। দলের পুরুষদের মধ্যে শুধু মোতালেবকে দেখা যাচ্ছে। সে ইতিমধ্যে শোবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তার পাশের সীটের ভদ্রলোককে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দু'টা সীট দখল করে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছে। দূর থেকে দেখলেই বোঝা যায় সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। অথচ কথা ছিল সারা রাত কেউ ঘুমুবে না। জরীর মনে হল — শেষটায় দেখা যাবে শুধু সে-ই জেগে আছে, আর সবাই ঘুমে। কামরায় গাড়িভরা ঘুম, রজনী নিঝুম।

রাত কত হয়েছে? জরীর হাতে ঘড়ি ছিল। এখন ঘড়ি নেই। কোথাও খুলে-টুলে পড়ে গেছে। ভালই হয়েছে। ঘড়িটা ঐ মানুষের দেয়া। দামি ঘড়ি। লোকটা কৃপণ না। সে তার স্ত্রীকে দামি-দামি জিনিসপত্র দিয়েই সাজিয়েছে। পরনের শাড়িটাও দামি। কত দাম জরী জানে না। লোকটার বোন এই শাড়ি তাকে পরাতে পরাতে বলেছিল, বেস্ট কোয়ালিটি, বালুচরি কাতান।

সেই বেস্ট কোয়ালিটি বালুচরি কাতান ভিজে এখন গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে। জরীর এখন নিজেকে অশুচি লাগছে। মনে হচ্ছে, ঐ লোকটা যেন তাকে জড়িয়ে ধরে আছে।

একজন সাধারণ মেয়ের জীবনেও কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে! জরী কি নিজেই ভেবেছিল সে এমন একটা কাণ্ড করতে পারবে? বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে আসবে?

যদি পালাতে না পারত তা হলে কী হত? তা হলে এই রাতটা হত তাদের বাসররাত। লোকটা তার শরীর নিয়ে কিছুক্ষণ ছানাছানি করে সিগারেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। আর সে সারা রাত জেগে বৃষ্টি দেখত। আচ্ছা, ঢাকায় কি এখন বৃষ্টি হচ্ছে?

ঐ লোকটা কী করছে? ঘুমুতে নিশ্চয়ই পারছে না। কিংবা কে জানে মদ-ফদ খেয়ে হয়তো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। তবে সেই ঘুম নিশ্চয়ই সুখের ঘুম না। নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে তার শরীর জ্বলে যাচ্ছে।

শুভ্র লক্ষ করল, ভেজা শাড়ির এক অংশ চাদরের মতো গায়ে জড়িয়ে জরী হন-হন করে যাচ্ছে। তার একবার ইচ্ছা হল জরীকে ডাকে। কিন্তু জরীর হাঁটার মধ্যে এমন এক আত্মমগ্ন ভঙ্গি যে, মনে হয় ডাকলেও সে থামবে না। একটা স্যুটকেসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জরীর পড়ে যবার মতো হল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে হাসল। কার দিকে তাকিয়ে হাসল?

শুভ্রর হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। আজ এক রাতের মধ্যে অনেকগুলি সিগারেট খাওয়া হয়েছে। বমি-বমি লাগছে, বুক জ্বালা করছে এবং মাথা কেমন হালকা লাগছে।। এই হালকা বোধ হওয়াটাই কি সিগারেটের নেশা? গাঁজা খেলে লজ্জা বাড়ে, ভাং-এর সরবত খেলে কী হয় এখনো জানা হয়নি।

'স্যার, একটু শুনবেন?'

শুভ্র চমকে উঠে বলল, আমাকে বলছেন?

'জ্বি, আপনাকেই বলছি।'

অপরিচিত একজন মানুষ। লম্বা, রোগা। মাথায় চুলের বংশও নেই। পরনে সাফারি। মেয়েলি গলার স্বর। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। এই লোককে আগে কখনো দেখেছে বলে শুভ্র মনে করতে পারল না।

'আমি কি আপনাকে চিনি?'

'জ্বি না স্যার।'

'আপনি আমাকে চেনেন?

'জ্বি স্যার, চিনি। আপনার বাবা ইয়াজউদ্দিন সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'বুঝতে পারছি না। তিনি আপনাকে হঠাৎ করে কীভাবে পাঠাবেন?'

'আপনার দেখাশোনা করার জন্যে আমি ঢাকা থেকেই গাড়িতে উঠেছি।'

শুভ্র শুকনো গলায় বলল, ও আচ্ছা। তা হলে আপনি ঠিকমতই দেখাশোনা করে যাচ্ছেন? বাবাকে খবর পাঠাচ্ছেন কীভাবে, ওয়্যারলেসে?'

'স্যার, আপনি শুধু শুধু আমার উপর রাগ করছেন।'

'আমি আপনার উপর রাগ করছি না, রাগ করছি বাবার উপর। আমি কল্পনাও করিনি বাবা একজন স্পাই পাঠাবেন।'

'স্যার, আপনি ভুল করছেন। আমি স্পাই না, আপনার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্যই আমি যাচ্ছি। আমাকে বলা হয়েছে, বড় রকমের কোনো সমস্যায় পড়লেই শুধু আপনাকে আমার পরিচয় দিতে।'

শুভ্র মন-খারাপ-করা গলায় বলল, আমি কি বড় রকমের কোনো সমস্যায় পড়েছি?

'জ্বি স্যার, পড়েছেন।'

'আমি তো কোনো সমস্যা দেখছি না।'

'আপনার ঘুমের অসুবিধা হচ্ছে।'

'আমার ঘুমের অসুবিধা একটা বড় ধরনের সমস্যা। আপনি আমার ঘুমের ব্যবস্থা করেছেন?'

'জ্বি।' তিনটা এয়ার কন্ডিশান্ড কোচ আপনার নামে রিজার্ভ করা আছে। খালি যাচ্ছে। আপনারা ঘুমাতে পারেন।'

'আমি তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না।'

'সারা রাত জেগে থেকে পরদিন জার্নি করলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন স্যার। অপনার শরীর তো ভাল না।'

'যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি আপনি নিশ্চয়ই ডাক্তারের ব্যবস্থাও করে ফেলবেন। কাজেই আমি কোনো সমস্যা দেখছি না।'

'আপনি স্যার শুধু শুধু আমার উপর রাগ করছেন। আমি হুকুমের চাকর।'

'আমি আপনার উপর রাগ করছি না। তবে আবার যদি কখনো আপনাকে আমার পেছনে ঘুরঘুর করতে দেখি তা হলে রাগ করব। খুব রাগ করব। আপনার নাম কী?'

'স্যার, আমার নাম সুলেমান।'

'সুলেমান সাহেব! আপনি দয়া করে বিদায় হোন। আমাকে আমার মতো থাকতে দিন।'

'জ্বি আচ্ছা, লাইটারটা রাখুন স্যার।'

'লাইটার দিয়ে কী করব?'

'আপনার সিগারেট নিভে গেছে।'

শুভ্র লাইটার হাতে নিজের জায়গায় ফিরে এল। আনুশকা বলল, শুভ্র, তুমি কি জরীকে দেখেছ? সে কোথায় জান?

'এখন কোথায় জানি না। তবে তাকে যেতে দেখেছি। হনহন করে যাচ্ছিল। একটা স্যুটকেসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে।'

'ও আমার উপর রাগ করে উঠে চলে গেছে।'

'কী নিয়ে রাগ করল?'

'কোনকিছু নিয়ে না। রাগটা ওর মনে ছিল। বের হয়ে এসেছে। তুমি কি রাগ ভাঙিয়ে ওকে নিয়ে আসবে?'

'আমি গেলে ওর রাগ ভাঙবে?'

'হ্যাঁ, ভাঙবে।'

শুভ্র জরীকে খুঁজতে বের হল। আশ্চর্য কাণ্ড! জরী কোথাও নেই। একজন মানুষ তো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না! কোথায় গেল সে? আখাউড়ায় ট্রেন কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিল। জরী কি তখন নেমে গেছে? শুভ্রর বুক কাঁপছে। সে আবার খুঁজতে শুরু করল।

'স্যার, আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?'

'না, কাউকে খুঁজছি না। আপনাকে না বলেছি আমার পেছনে ঘুরঘুর করবেন না?'

সুলেমান এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে কি ছায়ার মতো শুভ্রকে অনুসরণ করছে?

সুলেমান ইতস্তত করে বলল, 'ভেজা শাড়িপরা মেয়েটি স্যার বুফে কারে আছে।'

'ও আচ্ছা, থ্যাংক য়্যু। আপনি কি সারাক্ষণই আমার পেছনে পেছনে আছেন?'

'আমি স্যার দূর থেকে লক্ষ রাখছি।'

'আমি কী করছি না করছি সব দেখছেন?'

'জ্বি স্যার।'

'আমি যে বুফে কারের ম্যানেজারের গায়ে থুথু দিয়েছি, তাও দেখেছেন?'

সুলেমান কিছু বলল না। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শুভ্র একবার ভাবল বলে, এই ব্যাপারটা আপনি দয়া করে বাবাকে বলবেন না। তারপর মনে হল, এটা বলা ঠিক হবে না। অন্যায় অনুরোধ। অন্যায় অনুরোধ আর যে-ই করুক, সে করতে পারে না।

বুফে কার অন্ধকার। টেবিলগুলির উপর বালিশ এবং চাদর বিছিয়ে বুফে কারের লোকজন শুয়ে আছে। একটি টেবিলই শুধু খালি। তারই এক কোণায় জড়সড় হয়ে জরী বসে আছে। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাট আসছে।

শুভ্র ডাকল, জরী!

জরী খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, এসো। বসো আমার সামনে।

'একা একা কী করছ?'

'ভাবছি।'

কী ভাবছ?'

'শৈশব থেকে ভাবা শুরু করেছি। চার বছর বয়স থেকে আরম্ভ করেছি, যেসব

স্মৃতি মাথায় জমা আছে সেগুলি দেখার চেষ্টা করছি।'

'কোন পর্যন্ত এসেছ?'

'ক্লাস টেন। ক্লাস টেনে এসেই বাধা পড়ল। তুমি উদয় হলে।'

'শীত লাগছে না?'

'লাগছে। শীতে মরে যাচ্ছি। মনে হয় জ্বরও এসেছে। দেখো তো, গায়ে জ্বর আছে কি না।'

জরী হাত বাড়িয়ে দিল। কত সহজেই না সে তার হাত বাড়িয়েছে। দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই। বরং একধরনের নির্ভরতা আছে।

শুভ্র বলল, তোমার গায়ে জ্বর।

'বেশি জ্বর?'

'হ্যাঁ, বেশি। অনেক জ্বর। তোমার বৃষ্টিতে ভেজা ঠিক হয়নি।'

'বৃষ্টিতে না ভিজলেও আমার জ্বর আসত। আমি যখন বড় ধরনের কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পাই, তখন আমার জ্বর এসে যায়।'

'সেই জ্বর কতদিন থাকে?'

'সে হিসাব করিনি।'

'ভেজা কাপড় বদলাবে না?'

'বদলাতে পারলে ভাল হত। নিজেকে অশুচি লাগছে, তবে নোংরা বাথরুমে ঢুকে কাপড় বদলাতে ইচ্ছে করছে না।'

'তা হলে কী করবে? ভেজা কাপড়ে বসে থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'আনুশকা মন-খারাপ করে আছে। তুমি নাকি তার সঙ্গে ঝগড়া করেছ?'

জরী কিছু বলল না। জানালার অন্ধকারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জরী হাই তুলতে তুলতে বলল, প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে। ইস, একটা পুরো কামরা যদি আমার একার থাকত, তা হলে দরজা বন্ধ করে হাত-পা ছড়িয়ে কী আরাম করে ঘুমুতাম!

শুভ্র ইতস্তত করে বলল, আমি একটা খালি কামরার ব্যবস্থা করতে পারি। করব?

'একটা পুরো কামরা শুধু আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে করবে?'

'কীভাবে করব তা তোমার জানার দরকার নেই। করব কি না সেটাই জানতে চাচ্ছি।'

'প্লীজ শুভ্র, করো। কীভাবে করবে?'

'ম্যাজিক। বড়লোকদের হাতে অনকে ধরনের ম্যাজিক থাকে।'

শুভ্র বুফে কারের বাইরে এসে দেখে, সুলেমান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। সুলেমান মনে হল শুভ্রকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে। সে চলে যেতে ধরেছিল, শুভ বলল, একটা কামরার ব্যবস্থা করুন।

সুলেমান হতভম্ব গলায় বলল, আপনাদের দু'জনের জন্যে?

'না, একজন শুধু যাবে। তার শরীর খারাপ।'

'ও আচ্ছা। আমি স্যার, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'ভয় পাবার কিছু নেই।'

'একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা কি স্যার করব?'

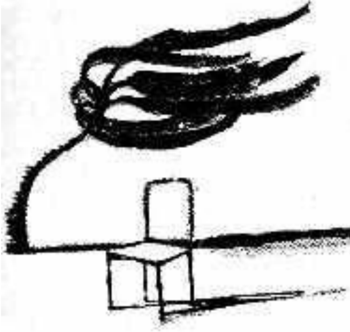
'আপনি কি ডাক্তারও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?'

'জ্বি না স্যার। খুঁজে বের করব। এত বড় ট্রেন, একজন-না-একজন ডাক্তার তো থাকবেনই। ডাক্তার কি লাগবে স্যার?'

'না।'

'আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হবেন না স্যার।'

শুভ্র বিস্মিত হয়ে তাকাল। লোকটাকে এখন আর তার এত খারাপ লাগছে না। কী রকম বিনীত ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে।



ট্রেন এসে চাটগাঁয়ে থামল ভোর পাঁচটায়। চারদিক অন্ধকার। ভোরের কোনো আভাস দেখা যাচ্ছে না। প্ল্যাটফর্মের আলো কামরায় ঢুকছে। এই আলোটুকুই ভরসা, কারণ, ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনের সব বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছে।

রানার হাতে একটা পেনসিল-টর্চ। প্রয়োজনের সময় কোনো জিনিসই কাজ করে না। রানার পেনসিল-টর্চও কাজ করছে না। বোতাম টিপে টিপে তার হাত ব্যথা হয়ে গেছে। অথচ এই পেনসিল-টর্চ রওনা হবার আগের দিন কেনা হয়েছে। রানা উঁচু গলায় বলল, কেউ ট্রেন থেকে নামবে না, আনটিল ফার্দার অর্ডার। যে যেখানে আছ সেখানেই থাক। মালের দিকে লক্ষ রাখো। নো মুভমেন্ট।

আনুশকা বলল, খামাখা চিৎকার কোরো না তো। শুধু শুধু হৈচৈ করছ কেন?

'শুধু শুধু হৈচৈ করছি? বাতি নেই কিছু নেই, এর মধ্যে একটা-কিছু যদি হয়?'

'কী হবে?'

'অনেক কিছুই হতে পারে। জরী কোথায়? জরীকে তো দেখছি না।'

'রানা, তোমার আলগা মাতব্বরি অসহ্য লাগছে।'

'অসহ্য লাগলেও কিছু করার নেই। সহ্য করে নিতে হবে। জরী কোথায়?'

শুভ্র বলল, জরী অন্য কামরায় ঘুমুচ্ছে। তার শরীর ভাল না।

রানা রাগী গলায় বলল, অন্য কামরায় ঘুমুচ্ছে মানে? কে ডিসিশান দিল? আমি কিছুই জানি না, আর দলের একজন মেম্বার অন্য কামরায় চলে গেল।

আনুশকা বলল, চিৎকার বন্ধ করো তো রানা! যথেষ্ট চিৎকার হয়েছে। তুমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানো। ইতিমধ্যে ভোর হবে। আমরা নামব।

'দলের ভালমন্দ আমি দেখব না?'

'তোমাকে কিছু দেখতে হবে না। অনেক দেখেছ।'

রানা রাগ করে ট্রেন থেকে নেমে গেল। নামার সময় নইমার পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল। ব্যাপারটা অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু নইমার ধারণা, রানা এই কাজটা ইচ্ছা করেই করেছে। নইমা অল্পতেই কাতর হয়। পায়ের ব্যথায় সে কাতরাচ্ছে। নীরা বলল,

তুই এমনভাবে চিৎকার করছিস, তাতে মনে হচ্ছে হাঁটুর নিচ থেকে তোর পা খুলে পড়ে গেছে।

'ব্যথা পেলে চিৎকার করব না?'

'এমন কিছু ব্যথা পাসনি যে ট্রেনের সব মানুষকে সেটা জানাতে হবে।'

'খামাখা ঝগড়া করছিস কেন? পায়ের চামড়া খুলে গেছে — আর . . .'

'তোর এত নরম চামড়ার পা তুই ফেলে ছড়িয়ে বসে আছিস কেন? কোলে নিয়ে বসে থাকলেই হত।'

নইমা কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। পায়ে স্যান্ডেল পরল। আনুশকা বলল, যাচ্ছিস কোথায়? নইমা বলল, দ্যাটস নান অব ইয়োর বিজনেস।

নইমা ট্রেন থেকে নেমে গেল। সে হাঁটতে শুরু করেছে ওভারব্রিজের দিকে।

জরীর খুব ভাল ঘুম হয়েছে। এসি দেয়া স্লীপিং বার্থের ব্যবস্থা ভাল। শুধু কামরাটা বেশি ঠাণ্ডা। কামরার অ্যাটেনডেন্ট বালিশ এবং কম্বল দিয়েছে। একা একটা কামরার দরজা বন্ধ করে ঘুমানোর আলাদা আনন্দ আছে। জরী অনেকদিন পর খুব আরাম করে ঘুমুল। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখল — সেইসব স্বপ্নও আনন্দময় স্বপ্ন। ভয়ংকর কোনো দুঃস্বপ্ন নয়।

এখন ট্রেন থেমে আছে। চিটাগাং এসে গেছে এটা সে বুঝতে পারছে। তার পরেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। জীবনের আনন্দময় সময়ের একটি হচ্ছে ঘুম-ঘুম ভাব নিয়ে শুয়ে থাকা।

দু'বার টোকা পড়ল দরজায়। জরী বলল, কে?

'আমি। আমি শুভ্র। আমরা এসে গেছি।'

জরী পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, ও, আচ্ছা।

শুভ্র বলল, এখন আমরা নামব।

জরী হাই তুলতে তুলতে বলল, আমি আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকতে চাই শুভ্র। এই ধরো, পাঁচ মিনিট।

'তোমার গায়ে কি জ্বর আছে?'

'বুঝতে পারছি না। মনে হয় আছে। শুভ্র, তুমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো না। তুমি নেমে যাও। আমি নিজে নিজেই নামব।'

'আচ্ছা। রাতে তোমার কি ভাল ঘুম হয়েছে?'

'খুব ভাল ঘুম হয়েছে।'

রানার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। মাথায় রক্ত ওঠার মতো অনেকগুলি কারণের

একটি হচ্ছে নইমা ট্রেন থেকে নেমে কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা ওভারব্রিজে উঠে গেছে। রানার একবার ইচ্ছা করছিল, ডেকে জিজ্ঞেস করে — যাচ্ছ কোথায়? শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেনি। কী দরকার? যাক যেখানে ইচ্ছা। তার দায়িত্ব কী? সে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে গেলে সবাই রেগে যায়। কী দরকার সবাইকে রাগিয়ে? হু কেয়ারস? গো টু হেল।

রানা খানিকক্ষণ নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করেছে। শেষটায় রওনা হয়েছে খোঁজ নিতে। ওদের ভাল লাগুক বা না লাগুক, খোঁজ তো রাখতেই হবে। রানা পুরো স্টেশন খুঁজে এল। নইমা নেই। কোনো মানে হয়? জ্বলজ্যান্ত একটা মেয়ে তো হারিয়ে যেতে পারে না বা বাতাসেও মিলিয়ে যেতে পারে না। হয়েছেটা কী? আনুশকাকে ঘটনাটা জানানো দরকার। সে শুনে হয়তো এমন কিছু বলবে, যাতে আবার মাথায় রক্ত উঠে যাবে।

রানা আনুশকাদের কামরার জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। আনুশকা বলল, কিছু বলবে?

'নইমা কোথায়?'

'প্ল্যাটফর্মে নেমেছে।'

'আমি তো কোথাও দেখলাম না।'

আনুশকা হাই তুলতে তুলতে বলল, আছে কোথাও। ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

'একটা মেয়ের কোনো "ট্রেস" নেই আর আমি ব্যস্ত হব না?'

'ট্রেস থাকবে না কেন? ট্রেস ঠিকই আছে। তুমি খুঁজে পাচ্ছ না।'

রানা রাগ সামালাতে একটু দূরে সরে গেল। সিগারেট ধরাল। আর তখন দু'জন পুলিশকে এগিয়ে আসতে দেখল। তাদের সঙ্গে সাদা পোশাকের একজন। সেও যে পুলিশের তা বোঝা যাচ্ছে। তারা থমকে দাঁড়ল। সাদা পোশাকপরা লোকটি এগিয়ে এল।

'আপনি কি ঢাকা থেকে আসছেন?'

'জ্বি।'

'কয়েকজনের একটা পিকনিক পার্টি?'

'জ্বি।'

'চারটি মেয়ে আছে আপনাদের দলে?'

'জ্বি।'

'ওদের একজনের নাম জরী?'

'জ্বি।'

'আপনাদের সবাইকে থানায় যেতে হবে।'

'কী বললেন?'

'আপনাদের থানায় যেতে হবে।'

'কেন?'

'ঢাকা থেকে ম্যাসেজ এসেছে, আপনারা মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে চলে এসেছেন।'

'কী বলছেন এসব!'

'আমাদের কাছে ইমফরমেশন যা আছে তাই বলছি।'

রানার হাতের সিগারেট নিভে গেছে। সে নেভা সিগারেটই টানছে। তার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। এ কী সমস্যা! এই সমস্যায় উদ্ধারের পথ কী? পুলিশের সঙ্গে প্রতিটি কথা মেপে বলতে হয়। বিচার-বিবেচনা করে বলতে হয়। মাথায় কোনো বুদ্ধি, কোনো বিচার-বিবেচনা আসছে না। বরং হঠাৎ করে প্রচণ্ড বাথরুম পেয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে বাথরুমে ছুটে না গেলে সমস্যা হয়ে যাবে। প্যান্ট ভিজে কেলেঙ্কারি হবে। রানা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, স্যার, আপনারা ঠিক বলছেন?

সাদা পোশাকের ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, আমরা ঠিক বলছি না ভুল বলছি তার বিবেচনায় আপনাকে যেতে হবে না। আমরা যে খবর পেয়েছি সেই হিসাবে কাজ করছি। আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। একজনের বিবাহিতা স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে চলে এসেছেন।

'খবরটা সত্য না স্যার। বিয়ে হয়নি।'

'আপনাদের খবরের উপর আমরা নির্ভর করি না। আমরা খবর পেয়েছি অনেক উপরের লেভেল থেকে।'

'ও, আচ্ছা।'

'মিসেস মনিরুজ্জামান কি আপনাদের সঙ্গে আছেন?'

'জ্বি স্যার।'

'মিসেস মনিরুজ্জামান যে আপনাদের সঙ্গে আছেন তা তো আপনারা একবাক্যেই স্বীকার করলেন। তার পরেও বলছেন — ভুল বলছি?'

'স্যার, আপনারা এখানে দাঁড়ান, আমি জরীকে নিয়ে আসছি।'

'শুধু তাকে আনলে হবে না। আপনাদের সবাইকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আপনারা যে কত বড় যন্ত্রণায় পড়েছেন সে সম্পর্কে আপনাদের কোনো ধারণা নেই। আপনার সিগারেট নেভা। আপনি নেভা সিগারেট টানছেন।'

রানা বলল, স্যার, সিগারেট খাবেন?

'না, সিগারেট খাব না।'

আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। ট্রেনের লোক সবাই প্রায় নেমে এসেছে। রানা কাঁপা পায়ে কামরায় উঠল। আনুশকার সঙ্গে কথা বলা দরকার। তারও আগে বাথরুমে যাওয়া দরকার। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ বাথরুম পেয়ে গেছে। একেই বলে শিকারের সময় কুত্তার ল্যাট্রিন।

'আনুশকা, একটু নিচে নেমে আসো। খুব জরুরি কথা আছে। এক্সট্রিম ইমার্জেন্সি।

'নইমাকে এখনো পাওয়া যায়নি?'

'নইমা-টইমা বাদ। অন্য ব্যাপার। সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

'অল্পতে অস্থির হয়ো না তো রানা। তোমার কি ব্লাডপ্রেশারের কোনো সমস্যা আছে? হাত কাঁপছে কেন?'

কঠিন কিছু কথা রানার মুখে এসেছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে সহজ ভঙ্গিতেই ব্যাপারটা আনুশকাকে বলল। নিচু গলায় বলল, অন্যদের শোনার এখন কিছু নেই। আনুশকার কোনো ভাবান্তর হল না। সে সহজ ভঙ্গিতেই এগিয়ে গেল। সাদা পোশাকের পুলিশ বলল, আপনিই কি মিসেস মনিরুজ্জামান?

'আমার নাম আনুশকা। মিসেস মনিরুজ্জামানকে আমি চিনি না।'

'আপনাদের আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

'কোনো ওয়ারেন্ট আছে?'

'পুলিশ যদি থানায় যেতে বলে তা হলে যেতে হয়। পুলিশের কাজে বাধা দিলে অ্যারেস্ট করা কোনো ব্যাপার না।'

আনুশকা সহজ গলায় বলল, আপনাদের পেছনে কি কোনো বড় কর্তাব্যক্তি আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'আপনার হাতে কি ওয়াকিটকি?'

'হ্যাঁ।'

'আমার পরিচয় কি আপনি জানেন?'

'অকারণ কথা বলে আপনি আমাদের সময় নষ্ট করছেন।'

'আমার পরিচয় জানতে পারলে আপনার হাত থেকে ওয়াকিটকি মাটিতে পড়ে যাবে। কাজেই আমি অকারণ কথা বলছি না। বাঘের উপর যে থাকে তার নাম টাগ। তিমির উপর তিমিঙ্গল। আপনি কিছু জানেন না বলেই এমন কড়া গলায় আমার সঙ্গে কথা বলার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন।'

পুলিশ অফিসার হকচকিয়ে গেল। সমস্যা এদিকে দিয়ে আসবে ভাবা যায়নি। এ দেখি আরেক যন্ত্রণায় পড়া গেল! আনুশকা বলল, আপনি কি অতি দ্রুত ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন?

'অবশ্যই পারব।'

'তাঁহলে দয়া করে আমার হয়ে একটা ইনফরমেশন ঢাকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। পুলিশের আইজি-কে খবর পাঠাতে হবে। আনুশকা নামের একটা মেয়েকে পুলিশ বিরক্ত করছে। নুরুদ্দিন সাহেব আমার ছোট মামা।'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'বিশ্বাস না হবার কী আছে? মানে আপা, সমস্যাটা হল . . .।'

'কোনো সমস্যা হয়নি। বরং আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে। আমাদের এক বান্ধবী — নইমা তার নাম। নইমাকে পাচ্ছি না। প্ল্যাটফরমেই আছে। ওকে দয়া করে একটু খুঁজে বের করে দিন।'

পুলিশের দলটা খানিকক্ষণ কোনো কথা বলল না। আনুশকা বলল, রানা, এসো তো, জিনিসপত্র নামাতে হবে। চা খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সকালবেলা চা না খেলে আমার মাথা ধরে যায়। রানা ফিসফিস করে বলল, আইজি নুরুদ্দিন সাহেব তোমার মামা? আনুশকা বলল, আরে দূর! পুলিশে আমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। কিছুক্ষণের জন্যে ওদের পিলে চমকে দিয়েছি। এরা খোঁজখবর করবে। এই ফাঁকে আমরা কেটে পড়ব।

'আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না।'

'আমার লাগছে। অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার ভাব হচ্ছে।'

আনুশকা খিলখিল করে হেসে ফেলল।

'হাসছ কেন? হোয়াই লাফিং?'

'তুমি বড় বিরক্ত করছ রানা। পুলিশের চেয়েও বেশি বিরক্ত করছ? শান্ত হও — শান্ত।'

'শান্ত হব?'

আনুশকা আবারো শব্দ করে হাসল। রানা চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। পৃথিবীতে মেয়েজাতটার সৃষ্টি কেন হল, সে ভেবে পাচ্ছে না।



ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। টেলিফোন ধরার আগে তিনি ঘড়ি দেখলেন। ভোর ৬টা ৪০ মিনিট। এত ভোরে টেলিফোন! কোনো কি সমস্যা হয়েছে? তিনি টেলিফোন ধরলেন।

'স্যার, আমি সুলেমান।'

'ভাল আছ সুলেমান?'

'জ্বি স্যার।'

'বলো কী বলবে।'

'ছোট সাহেবের বিষয়ে কথা বলব।'

'বলো, আমি শুনছি।'

'ওনারা স্যার চিটাগাং পৌঁছেছেন।'

'ভাল কথা। ঢাকা থেকে যখন রওনা হয়েছে তখন চিটাগাং তো পৌঁছবেই। এ ছাড়া কোনো খবর আছে?'

'একটু সমস্যা হচ্ছে স্যার।'

'তুমি ভেঙে ভেঙে না বলে একনাগাড়ে বলে যাও। কী ব্যাপার?'

'পুলিশ ঝামেলা করছে। সকালবেলা একদল পুলিশ এসে উপস্থিত — উনারা নাকি কার স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছেন। ভদ্রমহিলার স্বামী মামলা করেছেন। উনার কানেকশন ভাল। উপরের লেভেল থেকে চাপ আসছে।'

'আর কিছু?'

'জ্বি না স্যার, আর কিছু না।'

'ওদের কি থানায় নিয়ে গেছে?'

'থানায় নিয়ে যায়নি, তবে নিয়ে যাবে বলে মনে হয়।'

'শুভ্র কেমন আছে?'

'জ্বি, ভাল আছেন।'

'ও এই ঘটনায় নার্ভাস হয়নি?'

'উনি এইসব ব্যাপারে এখনো কিছু জানেন না।'

'ওর চোখে কি চশমা দেখেছ?'

'জ্বি।'

'ভেরি গুড। তুমি আরো কিছু বলবে, না টেলিফোন রেখে দেব?'

'আমাকে কিছু করতে বলছেন স্যার?'

'না, কিছু করতে বলছি না। তুমি শুধু লক্ষ রাখো।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'টেলিফোন তা হলে রাখি?'

'স্যার, আরেকটা খবর ছিল — বুফে কারের ম্যানেজার, তার নাম রশীদউদ্দিন ভুঁইয়া — সে রেলওয়ে পুলিশের কাছে এজাহার দিয়েছে — ছোট সাহেবের বিরুদ্ধে।'

'শোনো সুলেমান, তুমি সব কথা একবারে বলছ না কেন? ভেঙে ভেঙে কেন বলছ? রশীদউদ্দিন ভুঁইয়া শুভ্রের বিরুদ্ধে এজাহার কেন দেবে? শুভ্র কী করেছে?'

'উনি কিছু করেননি।'

'কিছু করেনি, শুধু শুধু এজাহার!'

'স্যার, ছোট সাহেব উনার গায়ে থুথু দিয়েছেন।'

'কী বললে? শুভ্র তার গায়ে থুথু দিয়েছে? শুভ্র?'

'জ্বি স্যার।'

'সত্যি দিয়েছে?'

'জ্বি স্যার, সত্যি?'

'কেন থুথু দিল?'

'চা চেয়েছিলেন। চা দিতে দেরি করেছিলেন, এই জন্যে থুথু।'

'চা দিতে দেরি করেছে, শুধু এই কারণে গায়ে থুথু দিয়েছে?'

'জ্বি। তবে স্যার রশীদউদ্দিন অত্যন্ত বদ টাইপের লোক। সে লিখিত অভিযোগ করেছে মারপিটের।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ইয়াজুদ্দিন সাহেব টেলিফোন রাখলেন। রাহেলার ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি ভীত গলায় বললেন, কার টেলিফোন? শুভ্রের?

'না। সুলেমান টেলিফোন করেছিল। শুভ্রের খবরাখবর দিল।'

'শুভ্র ভাল আছে?'

'হ্যাঁ, ভাল আছে।'

'ওর চশমা? হ্যান্ডব্যাগের সাইড পকেটে যে চশমা, সেটা বলেছ?'

'না, বলিনি।'

'বলনি কেন?'

'সুলেমান বলল, ও দেখেছে শুভ্রের চোখে চশমা আছে, কাজেই চশমার কথা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন মনে করিনি। রাহেলা, তুমি আমাকে খুব কড়া করে এক কাপ কফি করে দাও তো!'

রাহেলা চিন্তিত গলায় বললেন, খালিপেটে হঠাৎ কফি চাচ্ছ কেন? কখনও তো খাও না!'

ইয়াজউদ্দিন বিরক্ত স্বরে বললেন, কখনো খাই না বলে কোনোদিনও খাওয়া যাবে না তা তো না। এখন খেতে ইচ্ছা করছে। দুধ-চিনি কিছুই দেবে না। 'র' কফি।

রাহেলা কফি বানাতে গেলেন। ইয়াজউদ্দিন টেলিফোন করলেন রফিককে। রফিক তাঁর ঢাকা অফিসের জেনারেল ম্যানেজার। নির্ভর করার মতো একজন মানুষ। কোনো জটিল সমস্যাই রফিকের কাছে সমস্যা না।

'হ্যালো রফিক।'

'স্লামালিকুম স্যার।'

'দুঃখিত যে, এত সকালে তোমার ঘুম ভাঙালাম।'

'কোনো সমস্যা নেই তো স্যার? কী ব্যাপার?'

'তোমাকে একটু চিটাগাং যেতে হবে।'

'স্যার, আমি ফার্স্ট ফ্লাইটেই চলে যাব।'

'শুভ্র বোধহয় কী-একটা সমস্যায় পড়েছে। তুমি দূর থেকে সমস্যাটা লক্ষ করবে। সমস্যাটা কি বলব?'

'আপনার বলার দরকার নেই স্যার, আমি জেনে নেব।'

'রাখি রফিক।'

'জ্বি আচ্ছা। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি।'

'থ্যাংক য়্যু।'

রাহেলা কফি নিয়ে এসে দেখেন — ইয়াজউদ্দিন সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছেন। বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছেন।



গল্প-উপন্যাসের অ্যাডভেঞ্চার এবং বাস্তব জীবনের অ্যাডভেঞ্চার একরকমের হয় না। গল্প-উপন্যাসের পুলিশরা সবসময়ই বোকা ধরনের থাকে। অল্প ধমক-ধামকে তারা ভড়কে যায়। হাস্যকর সব কাণ্ড করে। বাস্তবের পুলিশরা মোটেই সেরকমের নয়। ধমক-ধামকে তারা অভ্যস্ত। এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না।

পুলিশের আইজি আনুশকার ছোটমামা শুনেও তারা তেমন ঘাবড়াল না। বিশ্বাস করল না, আবার অবিশ্বাসও করল না। রানা লক্ষ করল, এরা প্ল্যাটফর্মে আছে। শুধু একজন নেই। সে খুব সম্ভবত টেলিফোন করতে গেছে। সে ফিরে এলে কী হবে কে জানে? সবাইকে থানায় যেতে হলে কেলেঙ্কারি। রানা একবার বাথরুম করে এসেছে। আবার বাথরুম পেয়ে গেছে। শরীরের সব জলীয় পদার্থ বের হয়ে যাচ্ছে।

এরকম একটা টেনশানের ব্যাপার, কিন্তু দলের মধ্যে কোনো উদ্বেগ নেই। অবশ্যি আনুশকা ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না। কাউকে বলা হয়নি। আনুশকার ভেতর খানিকটা ভয়-ভীতি থাকা উচিত। এবং আনুশকার উচিত সবাইকে জানানো। সে তা করছে না। বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে প্ল্যাটফর্মে মালপত্র নামাচ্ছে।

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই জরী খুব হাসিখুশি। সে রানাকে এসে বলল, আমাকে একটা টুথব্রাস এনে দিতে পারবে?

রানা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, টুথব্রাশ দিয়ে কী করবে?

জরী বলল, খেলব।

'খেলব মানে কি?'

জরী বলল, টুথব্রাশ দিয়ে মানুষ কী করে তুমি জান রানা। শুধু শুধু জিজ্ঞেস করলে কেন টুথব্রাশ দিয়ে কী করব? আমি কিছুই আনিনি, কাজেই আমার টুথব্রাশ লাগবে, পেস্ট লাগবে, আয়না লাগবে, চিরুনি লাগবে।

রাগে রানার গা জ্বলে যাচ্ছে। এত বড় বিপদ সামনে, অথচ মেয়েটা কিছুই বুঝতে পারছে না। বোঝার চেষ্টাও করছে না। চেষ্টা করলে রানার শুকনো মুখ থেকে এতক্ষণে ঘটনা আঁচ করে ফেলত। মেয়েরা যে আয়নায় নিজের মুখ ছাড়া অন্য কোনো মুখের দিকেই ভালমত তাকায় না এটাই বোধহয় ঠিক। হোয়াট এ সেলফিস ক্রিয়েচার! হযরত আদম যে এত বড় শাস্তি পেলেন, এদের জন্যেই পেয়েছেন।

জরী বলল, কী হয়েছে? এমন পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? টুথব্রাশ একটা কিনে নিয়ে এসো। দাঁত মেজে চা খাব। চা আনতে কেউ কি গেছে?

'চা-ফার কথা ভুলে যাও। ফরগেট এবাউট টী। সামনে গজব।'

'গজব মানে?'

'আনুশকাকে জিজ্ঞেস কর "সামনে গজব"-এর মানে কী। সে তোমাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবে। তখন আর দাঁত মাজতে ইচ্ছা হবে না। ইচ্ছা করবে সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত টেনে তুলে ফেলতে।'

জরী আনুশকার কাছে গিয়ে বলল, কোনো সমস্যা হয়েছে?

আনুশকা বিরক্ত গলায় বলল, সমস্যা হবে কেন? কে বলেছে সমস্যার কথা?

'রানা বলছে। ওকে একটা টুথব্রাশ আনতে বলেছিলাম, ও ভয়ংকর গলায় বলল — সামনে নাকি গজব'।

আনুশকা বলল, তুই ওর কথায় কান দিবি না। টুথব্রাশের কথা ভুলে যা। আঙুলের ডগায় পেস্ট নিয়ে দাঁত মেজে ফেল। মোতালেব কোথায়, মোতালেব? ওর না মাইক্রোবাস ঠিক করার কথা?

রানা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। আনুশকার কথায় রাগে আবার তার গা জ্বলে গেল। মাইক্রোবাস ঠিক করার দায়িত্ব মোতালেবের না, তার। সে ঠিক করেও রেখেছে। এক ফাঁকে দেখে এসেছে, বাস স্টেশনে চলে এসেছে। পুলিশের নাকের উপর দিয়ে মাইক্রোবাসে চড়ে বসা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না তা বুঝতে পারছে না বলেই সে চুপচাপ আছে। নয়তো এতক্ষণে জিনিসপত্র বাসে তুলে ফেলত। রানার বাথরুমে যাওয়াটা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। এদেরকে পুলিশের হাতে ফেলে যেতেও ইচ্ছা করছে না। কী থেকে কী হয়ে যাবে কে জানে? বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশ ছুঁয়ে দিলে আঠারো দুগুণে ছত্রিশ ঘা। প্লাস দু ঘা এক্সট্রা। সব মিলিয়ে আটত্রিশ ঘা।

প্ল্যাটফর্মের এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের দলটি থেকে একজন এদিকেই আসছে। রানার পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেছে। বুক খাঁ-খাঁ করছে।

পুলিশ অফিসার আনুশকার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আনুশকা তার চামড়ার ব্যাগের ফিতা লাগাচ্ছিল। সে পুলিশ অফিসারের দিকে না তাকিয়েই বলল, কিছু বলবেন?

'আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?'

'রাঙ্গামাটি।'

'ওখানে কি হল্ট করবেন?'

'জায়গা পছন্দ হলে করব। পছন্দ না হলে করব না।'

'থাকবেন কোথায়?'

'হোটেল নিশ্চয়ই আছে। আছে না?'

'পর্যটনের মোটেল আছে।'

'তা হলে পর্যটনের মোটেলেই থাকব।'

'রুম কি বুক করা আছে?'

'এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'এত কথা জিজ্ঞেস করেছি, কারণ আপনাদের দলেরই একজন খানিকক্ষণ আগে বললেন — আপনারা সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে যাচ্ছেন। যিনি বলেছেন তাঁর নাম মোতালেব।'

জরী হাই তুলতে তুলতে বলল, ও কিছু জানে না। শুরুতে আমাদের সেন্ট মার্টিন যাবার প্ল্যান ছিল, পরে বদলানো হয়েছে। মোতালেব শেষ খবর পায়নি। আমরা যখন ফাইন্যাল ডিসিশন নিই তখন সে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল।

পুলিশ অফিসার আগের মতোই সহজ গলায় বললেন, আপনাদের নেবার জন্য স্টেশনে একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। বাসটা রাঙ্গামাটি যাবে না। বাস যাবে টেকনাফ।

'এত খবর নিয়ে ফেলেছেন?'

'পুলিশে চাকরি করি। আমাদের কাজই হল খবর নেয়া!'

'আর কী খবর নিলেন?'

'আরেকটা খবর হচ্ছে — নইমা বলে আপনার যে বান্ধবীকে পাওয়া যাচ্ছে না বলছিলেন তিনি চা খাচ্ছেন। স্টেশনের বাইরে টী-স্টল আছে। সেখানে চা খাচ্ছেন।'

'তাকে কি বলেছেন যে, আমরা তার খোঁজ করছি?'

'জ্বি, বলা হয়েছে।'

'থ্যাংক য়্যু। থ্যাংক য়্যু ভেরি মাচ।'

'আমরা আরেকটা খবর নিয়েছি। ঢাকায় ওয়্যারলেস করে জেনেছি, আইজি নুরুদ্দিন সাহেবের আনুশকা নামে কোনো ভাগ্নি নেই।'

আনুশকা মোটেই চমকাল না। সে এত স্বাভাবিকভাবে তার ব্যাগ ঠিক করছে যে রানা মুগ্ধ হয়ে গেল। একেই বোধহয় বলে ইস্পাতের নার্ভ। এই নার্ভ কতক্ষণ ঠিক থাকে তা দেখার ব্যাপার। বেশি টেনশানে ইস্পাতের নার্ভেরও ছিঁড়ে যাবার কথা। আনুশকার নার্ভ কখন ছিঁড়বে? রানা সেই দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে পারছে না। তার বাথরুমে না গেলেই নয়। সে বাথরুমের সন্ধানে রওনা হল।

পুলিশ অফিসার বললেন, আপনারা কি আমাদের সঙ্গে থানায় যাবেন?'

আনুশকা বলল, হ্যাঁ, যাব।

'তা হলে চলুন।'

'এখন তো যেতে পারব না। হাত-মুখ ধোব, চা খাব, তারপর যাব। আপনারা এতক্ষণ অপেক্ষা করবেন?'

'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি। আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।'

শুভ্র এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। সে অবাক হয়ে বলল, কথাবার্তা কী হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

পুলিশ অফিসার বললেন, থানায় চলুন। থানায় যাওয়ামাত্রই সব জলের মতো পরিস্কার বুঝে যাবেন। পুলিশের অনেক কথাই বাইরে অর্থহীন মনে হয়। থানা হাজতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি শব্দের অর্থ পরিস্কার হয়ে যায়।

'থানায় যেতে হবে কেন?'

'সেটাও থানায় গেলেই জানতে পারবেন।'

এতক্ষণে গাড়ি থেকে সবাই নেমে এসেছে। পুলিশের কথাবার্তা যথেষ্ট উদ্বেগের সঙ্গে শুনে যাচ্ছে। জরীর চোখে-মুখে হতভম্ব ভাব। রানা তা হলে ভুল বলেনি। সমস্যা কিছু-একটা হয়েছে। জরী বলল, ব্যাপার কী রে আনুশকা? উনি আমাদের থানায় যেতে বলছেন কেন?

আনুশকা সহজ গলায় বলল, ওনার ধারণা, আমরা মনিরুজ্জামান নামের এক ভদ্রলোকের স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছি। এই জন্যেই আমাদের থানায় যেতে বলছেন।

জরী আগের চেয়েও অবাক গলায় বলল, মনিরুজ্জামানের স্ত্রীটি কে?

'মনে হচ্ছে তুই। যে বদমাশটার সঙ্গে তোর বিয়ে হবার কথা ছিল ওর নামই তো মনিরুজ্জামান, তাই না?'

জরীর মুখে কোনো কথা ফুটল না। সে বড়ই অবাক হয়েছে। আনুশকা বলল, তোরা সবাই হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নে। আমরা থানায় যাচ্ছি। চা ওখানেই খাব।

নীরা ভীত গলায় বলল, এসব কী হচ্ছে? শুধু শুধু থানায় যাব কেন?

পুলিশ অফিসার অমায়িক ভঙ্গিতে হাসলেন।

আনুশকা বলল, আমরা আমাদের মালপত্র কী করব? এখানে রেখে যাব, না সঙ্গে নিয়ে যাব?

'সেটা আপনাদের ব্যাপার। আপনারা ঠিক করবেন। দেরি করবেন না, চলুন।'

আনুশকা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, রানা কোথায় গেল? ও হচ্ছে আমাদের টীম লীডার। মালপত্রের ব্যাপারে ওর ডিসিশান লাগবে।

রানা টয়লেট খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিপদের সময় কিছুই পাওয়া যায় না। এ পর্যন্ত দু'জনকে জিজ্ঞেস করল, টয়লেট কোথায়? দু'জনই এমনভাবে তাকাল যেন এই

শব্দটা জীবনে প্রথম শুনছে। টয়লেট শব্দের মানে কী জানে না। স্টেশনের কাউকে ধরা দরকার। এরাও সব উধাও। নইমাকে দেখা যাচ্ছে। বেশ হাসি-হাসি মুখে আসছে। হাতে পত্রিকা। নাইমা বলল, এই রানা, যাচ্ছ কোথায়?

'টয়লেট খুঁজছি। টয়লেটটা কোথায় জান?'

'আমি কী করে জানব?'

'না জানলে বলো, জানি না। রেগে যাচ্ছ কেন?'

'মেয়েদের টয়লেট সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করাই অভদ্রতা। এই জন্যে রেগে যাচ্ছি। তোমার কি ইমারজেন্সি?'

হ্যাঁ, ইমারজেন্সি।'

'বড় টয়লেট, না ছোট টয়লেট?'

'কী যন্ত্রণা! ছোট।'

'তা হলে কোনো-একটা ট্রেনের কামরায় ঢুকে পড়লেই হয়। ছুটে বেড়াচ্ছ কেন?'

বিপদের সময় সব এলোমেলো হয়ে যায়, এটা খুবই সত্যি। সাধারণ ব্যাপারটা তার মাথায় আসেনি কেন? রানা লাফ দিয়ে সামনের একটা ট্রেনের কামরায় উঠে গেল।

নইমা অপেক্ষা করছে। রানা নামলে তাকে একটা মজার জিনিস দেখাবে। রানা রাজি থাকলে তাকে নিয়ে আরেক কাপ চা খাবে। ওরা নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ টেনশানে ভুগুক। হু কেয়ারস?

রানা নামতেই নইমা বলল, চাটগাঁর লোকরা 'ঘুমুচ্ছি'-কে কী বলে জান? তারা বলে, 'ঘুম পাড়ি'। ঘুম কি ডিম নাকি যে ডিম পাড়ার মত ঘুম পাড়বে? হি-হি-হি।

রানা ধমকের সুরে বলল, হাসি বন্ধ করো।

'হাসি বন্ধ করব মানে?'

'কেলেংকেরিয়াস ব্যাপার হয়ে গেছে। পুলিশ আমাদের অ্যারেস্ট করেছে।'

'তুমি এত ফালতু কথা বল কেন?'

'মোটেও ফালতু কথা বলছি না। অবস্থা সিরিয়াস। উই আর আন্ডার অ্যারেস্ট।'

'আমরা কী করেছি? ডাকাতি করেছি?'

'তোমরা ডাকাতির চেয়েও বড় জিনিস করেছ। অন্যের বউ ভাগিয়ে নিয়ে চলে এসেছ।'

'রানা, তোমার ব্রেইনের নাট-বল্টু সব খুলে পড়ে গেছে। তুমি ঢাকায় গিয়েই ধোলাইখালে চলে যাবে। নাট-বল্টু লাগিয়ে নেবে। তোমার যা সাইজ, রেডিমেড পাওয়া যাবে না। লেদ মেশিনে বানাতে হবে।'

রানা আগুন-চোখে তাকাল। সে ভেবে পাচ্ছে না পুরুষ এবং মেয়ের মস্তিষ্কের ঘিলুর পরিমাণ সমান হওয়া সত্ত্বেও মেয়েরা পৃথিবীর কিছুই বোঝে না কেন?

যে বাস ওদের টেকনাফ নিয়ে যাবে বলে এসেছে সেই বাসে করেই ওরা থানায় যাচ্ছে। পুলিশের দু'জন লোক বাসে আছে। একজন বসেছে ড্রাইভারের পাশে, অন্যজন আনুশকাদের সঙ্গে। নইমা সেই পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে করুণ গলায় বলল, আচ্ছা, চিটাগাং-এর লোকরা 'ঘুমাচ্ছি' না বলে 'ঘুম পাড়ি' বলে কেন? ঘুম কি ডিম যা পাড়তে হয়? সবাই হো-হো করে হাসছে। পুলিশ অফিসারটি হাসছে না।

সে তাকিয়ে আছে শুভ্রের দিকে। শুভ্র বলল, আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন?

'হ্যাঁ, বলব। আপনার নাম শুভ্র?'

'জ্বি।'

'আপনার বিরুদ্ধে আলাদা স্পেসিফিক অভিযোগ আছে। গুণ্ডামির অভিযোগ। আপনি রশীদউদ্দিন ভূঁইয়া নামে বুফে কারের কেয়ারটেকারকে মারধোর করেছেন। চাকু দিয়ে ভয় দেখিয়েছেন এবং এক পর্যায়ে তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ঠেলে নিচে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছেন।'

শুভ্র শুধু একবার বলল — আমি?

বলেই সে চুপ করে গেল। অন্য সবাই চুপ। শুধু নইমা এখনো হেসে যাচ্ছে। চিটাগাং-এর লোকেরা ঘুমিয়ে পড়াকে কেন 'ঘুম পাড়ি' বলে — এটা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছে না।

অয়ন বাসের বড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুনার পাশে খালি জায়গা আছে। সে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে মুনার পাশের জায়গাটাই সবচে' কাছে। কাজেই অয়ন যদি সেখানে গিয়ে বসে কেউ অন্য কিছু মনে করবে না। সে ঠিক ভরসাও পাচ্ছে না। মুনা যদি ফট করে কিছু বলে বসে।

রানা বলল, তুই হাঁদার মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বসো না।

অয়ন মুনার পাশে বসতে গেল। মুনা বলল — আপনার গা থেকে বিশ্রী গন্ধ আসছে। অন্য কোথাও গিয়ে বসুন।

অয়ন আগের জায়গায় ফিরে গেল।



ওসি সাহেব তাদের থানার লকআপে ঢুকিয়ে দিলেন। ছেলেরা এবং মেয়েরা আলাদা হয়ে গেল। এই ওসি সাহেবকে স্টেশনে দেখা যায়নি। তিনি স্টেশনে যাননি। ভদ্রলোকের বয়স বেশি না। ভদ্র চেহারা। পুলিশের ভদ্র চেহারা হলে অস্বস্তি লাগে। মনে হয় কিছু-একটা ঝামেলা আছে। তা ছাড়া ভদ্রলোক পাঞ্জাবি পরে আছেন। পুলিশের লোক থানার ভেতরে পাঞ্জাবী পরবেন কেন?

জেনানা ওয়ার্ডে এক অল্পবয়স্ক পাগলীকে রাখা হয়েছে। সে বমি করে পুরোটা ভাসিয়ে ফেলেছে। সে শুধু বমি করেই ক্ষান্ত হয়নি — মনের আনন্দে নিজের বমিতে গড়াগড়ি করছে। ভয়ংকর গন্ধ। কোনো স্বাভাবিক মানুষ এর মধ্যে থাকতে পারে না। প্রথমে নইমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ফিসফিস করে বলল, এখানে এক ঘণ্টা থাকলে আমি মরে যাব। আমি সত্যি মরে যাব। কেন আমি তোদের সঙ্গে এলাম! কেন এলাম? কেন এলাম? নইমার হিস্টিরিয়ার মতো হয়ে গেল।

আনুশকা বলল, ন্যাকামি করবি না। এখন ন্যাকামির সময় না।

'আমি ন্যাকামি করছি? আমি করছি ন্যাকামি? আমি ন্যাকামি করছি?'

'চুপ কর। এক কথা বারবার বলবি না।'

নইমা ওয়াক ওয়াক করতে লাগল। সে যেভাবে ওয়াক ওয়াক করছে — মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যে তার পাকস্থলীর পুরোটা বের হয়ে আসবে।

আনুশকা কঠিন গলায় বললো, তুই যদি ওয়াক ওয়াক বন্ধ না করিস তা হলে আই স্যোয়ার বাই দ্য নেম অব গড — এই বমির খানিকটা তোকে খাইয়ে দেব।

নইমা ওয়াক ওয়াক বন্ধ করল। তবে সে বসে পড়ল। মনে হচ্ছে সে সত্যি সত্যি অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, আনুশকা, আমি মরে যাচ্ছি। আমি সত্যি মরে যাচ্ছি। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। তালাবন্ধ ঘরে আমি থাকতে পারি না। আমার ক্লস্টোফোবিয়া আছে।

মুনা নইমাকে ধরে রেখেছে। তার হাতে একটা ম্যাগাজিন। সে ম্যাগাজিনটা পাখার মতো করে ক্রমাগত নইমার মাথায় বাতাস করে যাচ্ছে।

নীরা মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। সেও কাঁপছে থরথর করে। জরী একদৃষ্টিতে পাগলী মেয়েটাকে দেখছে। মেয়েটা কুৎসিত

নোংরায় মাখামাখি হয়ে আছে। মাথার চুল ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে কাটা। তার পরেও এই মেয়েটি যে রূপবতী তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

নইমা গোঙানির মতো শব্দ করতে লাগল। মুনা ভয় পেয়ে আনুশকাকে বলল, আপা, উনি কেমন জানি করছেন। আনুশকা গলা উঁচিয়ে ডাকতে লাগল — কে আছেন এখানে? কে আছেন? ওসি সাহেব! ওসি সাহেব!

ওসি সাহেব এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। মুখের ভঙ্গি অত্যন্ত শান্ত। যেন কিছুই হয়নি।

'হৈচৈ করছেন কেন?'

'সঙ্গত কারণেই হৈচৈ করছি। কেন করছি সেটা আপনার না বুঝতে পারার কোনো কারণ নেই। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনি বুদ্ধিমান। তবে বুদ্ধিমান লোকরা মাঝে মাঝে খুব কাঁচা কাজ করে। আপনি আমাদের হাজতে ঢুকিয়ে যে কাঁচা কাজটি করেছেন তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হবার সম্ভাবনা।'

ওসি সাহেব আগের চেয়েও শান্ত গলায় বললেন, মিস আনুশকা, কাঁচা কাজ আমাদের প্রায়ই করতে হয়। কাঁচা কাজ করতে যে আমরা ভালবাসি কিংবা ইচ্ছা করে করি তা না। উপরের নির্দেশ পেয়েই করি।

'উপরের নির্দেশ পেয়েছেন বলে আমাদের একটা পাগলীর সঙ্গে খাঁচার ভেতর আটকে রাখতে হচ্ছে?'

'অবশ্যই। আপনাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে — আপনাদের ক্ষমতা আছে। আপনাদের যোগাযোগ ভাল। খোদ প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গেও আপনাদের কারোর আত্মীয়তা থাকা মোটেই বিচিত্র না। আমি শখ করে আপনাদের এখানে ঢোকাব কেন?'

'আপনি আমাদের আটকে রাখবেন?'

'জ্বি। আমার উপর সেরকমই নির্দেশ। আপনাদের বিরুদ্ধে কিডন্যাপিং-এর মামলা আছে। একজনের বিবাহিতা স্ত্রীকে আপনারা কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছেন। তার গায়ে চার লক্ষ টাকার গয়না আছে। কোর্ট থেকে আপনাদের গ্রেফতার করতে বলা হয়েছে। আমরা করেছি। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনাদের কোর্টে হাজির করব। তখন কোর্ট যদি আপনাদের জামিন দেয় — আপনারা যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে চলে যাবেন। আমরা কাজ করছি According to the Books.'

'আমি কয়েকটা টেলিফোন করব।'

'আমাদের টেলিফোন নষ্ট।'

'অর্থাৎ আপনি আমাদের টেলিফোন করতেও দেবেন না?'

'বললাম তো, আমাদের টেলিফোন নষ্ট। ডায়াল টোন নেই।'

'কতক্ষণ আমাদের এভাবে আটকে রাখবেন?'

'মনিরুজ্জামান সাহেব ঢাকা থেকে রওনা হয়েছেন। উনি এসে পৌঁছার পরই ব্যবস্থা হবে।'

'উনি কখন এসে পৌঁছবেন?'

'সেটা নির্ভর করে উনি কিসে আসেন তার উপর। ফার্স্ট ফ্লাইটে এলে বেলা ন'টার মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা। যদি হেঁটে আসেন তা হলে দিন দশেক লাগার কথা।'

'আপনি কি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছেন ওসি সাহেব?'

'জ্বি, করছি। শুধু আপনারাই রসিকতা করতে পারবেন আর আমরা পুলিশের চাকরি করি বলে রসিকতা করতে পারব না — তা তো হয় না।'

আনুশকা হাল ছেড়ে দিল। ওসি সাহেব চলে যেতে ধরলেন, তখন জরী নরম গলায় ডাকল, ওসি সাহেব, আপনি কি আমার কিছু কথা শুনবেন?

'জ্বি শুনব। বাংলাদেশের পুলিশের বর্তমানে প্রধান কাজ হচ্ছে কথা শোনা। আমরা সবার কথা শুনি। বলুন কী বলবেন?'

'সমস্যাটা তো আমাকে নিয়ে? আমি তো আছিই। আমাকে যেখানে রাখবেন আমি সেখানেই থাকব এবং মনিরুজ্জামান সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করব। আপনি এদের ছেড়ে দিন। আর ছেড়ে দিতে না পারলে অফিসে নিয়ে বসান। প্লীজ। তাকিয়ে দেখুন — আমাদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।'

'আপনাদের কষ্ট করতেই হবে। উপায় নেই।'

আনুশকা বলল, খুব ভাল কথা। আমাদের ছাড়তে না পারেন — ঐ পাগলীটাকে ছাড়ুন। তাকে ধরে রেখেছেন কেন? সেও কি কাউকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে?

'না, সে কাউকে কিডন্যাপ করে আনেনি।'

'তা হলে তাকে হাজতে ভরে রেখেছেন কেন? হাতের কাছে সুন্দরী মেয়েছেলে না থাকলে ভাল লাগে না?'

'দেখুন মিস আনুশকা, আপনি সকাল থেকেই অত্যন্ত আপত্তিকর কথা বলে যাচ্ছেন।'

'যতক্ষণ আমাদের না ছাড়বেন ততক্ষণ বলব। তা ছাড়া আপনারা রূপবতী বিকৃতমস্তিষ্ক একটি মেয়েকে অকারণে ধরে রেখে দেবেন, আমরা কিছু বলতেও পারব না?'

'অকারণে ধরে রাখিনি। পাগল গ্রেফতার করার বিধান আছে। তা ছাড়া মেয়েটি

সুন্দরী। পাড়ার মাস্তানদের হাতে ঘন ঘন রেপ্‌ড হবার কপাল নিয়ে এসেছে। তাকে বাঁচানোর জন্যেই এখানে এনে রেখেছি।'

'যারা রেপ করছে তাদের কিছু বলছেন না, যে রেপ্‌ড হচ্ছে তাকে হাজতে ভরে রেখেছেন! আপনারা তো অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করছেন। শুনুন ওসি, আমি অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনীত ভাষায় আপনার কাছে একটি অনুরোধ করছি — তাকিয়ে দেখুন, হাত জোড় করে বলছি। এই পাগলীটাকে ছাড়তে হবে না। একে হাজতেই রাখুন — তবে দয়া করে একে ভাল করে সাবান দিয়ে একটা গোসল দিন। আমি টাকা দিচ্ছি — বাজার থেকে কিনে নতুন শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোট নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। ওর গায়ে যেসব কাপড় আছে সেগুলি হয় মাটির নিচে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করুন, কিংবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিন। আগুন জ্বালাবার খরচও আমি দেব। তারপর আপনি যা করবেন তা হচ্ছে — বড় দু' বালতি পানি পাঠাবেন, একটা শলার ঝাড়ু পাঠাবেন এবং এক লিটারের একটা ফিনাইলের কৌটা পাঠাবেন। আমি নিজেই এই হাজতখানা ধোব। আমি নিজে যে ধোব, তার জন্যেও আপনাকে খরচপাতি দেব। এইখানেই শেষ না — পরবর্তী সময়ে আপনাকে পুরস্কৃত করব।'

'আমাকে পুরস্কৃত করবেন?'

'জ্বি। আপনাকে এমন এক জায়গায় ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করব যেখানে খুনের ছড়াছড়ি। প্রতি সপ্তাহে একটা করে মার্ডার হয় — তিনটা রেপ — গোটা দশেক ডাকাতি প্লাস চোরাচালানি। এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবেন না ওসি সাহেব। **Chance of lite time.**'

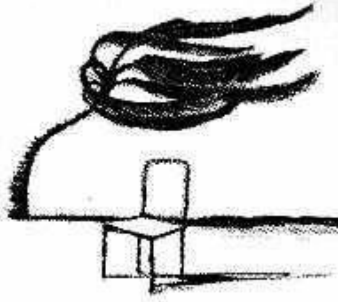
মুনা খিলখিল করে হাসছে। এমন আনন্দিত ভঙ্গিতে সে অনেকদিন হাসেনি। তাকে হাসতে দেখে পাগলীটাও হাসছে। ওসি সাহেব কিছু বললেন না। যেরকম শান্ত ভঙ্গিতে এসেছিলেন সে রকম শান্ত ভঙ্গিতে চলে গেলেন।

তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক বালতি পানি এবং ঝাঁটা নিয়ে জমাদার উপস্থিত হল। দাঁত বের করে বলল, ওসি সাহেব বলছেন, শাড়ি তেল সাবান কী কী জানি কিনবেন — টেকা দেন।

আনুশকা তার পার্স খুলে টাকা বের করল। জরীর দিকে তাকিয়ে বলল, জরী শোন, তুই কোনো ভয় পাচ্ছিস না তো? না, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই ওসি মানুষটা খারাপ না। তোর কোনো বিপদ ওই ওসি হতে দেবে না।

'এরকম মনে হবার কারণ কি?'

'কোনো কারণ নেই —। ইনট্যুশন।'



এরকম যে কিছু ঘটবে রানা জানত। বিপদের ইঙ্গিত মানুষের কাছে আগে আগে পৌঁছে। আল্লাহ্‌পাক মানুষকে ইশারা দেন। রানাকেও দিয়েছেন। রানা সেই ইশারা বুঝতে পারেনি। চিটাগাং রওনা হবার সময় সে দেখেছে টেবিলে খালি পানির জগ। এটা হল প্রথম ইশারা। দ্বিতীয় ইশারা হল, সে যে-বেবিট্যাক্সি নিয়ে রওনা হল মাঝপথে সেটার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। কার্বোরেটার দিয়ে তেল পাস করছে না। এটা হল দ্বিতীয় ইশারা। সে নিতান্ত বেকুব বলেই পরিষ্কার ইশারাও ধরতে পারেনি। এতক্ষণে তারা কক্সবাজার পৌঁছে যেত। তার বদলে থানা-হাজতে বসে আছে।

রানার আবার বাথরুম পেয়েছে। এক রাতের টেনশানে ডায়াবেটিস হয়ে গেল নাকি? টেনশানে নানান ধরনের অসুখবিসুখ হয়, ডায়াবেটিসও হতে পারে। ঢাকায় পৌঁছেই সুগার টেস্ট করাতে হবে। হাজতে ঢোকার পর এর মধ্যে দু'বার বাথরুমে গেছে। তৃতীয়বার যেতে চাওয়া কি ঠিক হবে? শেষে এরা বিরক্ত হয়ে বলবে — 'পিসাব-পায়খানা' যা করার এইখানেই করেন। থানাওয়ালাদের এখন বিরক্ত করা যাবে না। কিছুতেই না। এই সাধারণ সত্যটা দলের কেউ বুঝতে পারছে না। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তারা এখানেও পিকনিক করছে। এদের ধরে ধরে চাবকাতে হবে।

মোতালেব এর মধ্যে পুলিশ-সেন্ট্রিকে হাত ইশারা করে ডেকে বলেছে — 'মটু ভাইয়া, চায়ের ব্যবস্থা করা যায়?' এই পুলিশের স্বাস্থ্য একটু ভালর দিকে। ভালর দিকে বলেই তাকে 'মটু ভাইয়া' বলতে হবে? পুলিশের হাজতে বসে পুলিশকে 'মটু ভাইয়া' বলা! রানা ভেবে পাচ্ছে না এদের সবার একসঙ্গে ব্রেইন শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে কি না। এত বড় একটা বিপদ যাচ্ছে, সেই বিপদ নিয়ে চিন্তা নেই। কী করে উদ্ধার পাওয়া যায় তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। মেয়েগুলিকে আলাদা করে ফেলেছে এটাও চিন্তার বিষয়। বিরাট চিন্তার বিষয়। কে চিন্তা করবে? সব চিন্তা কি সে একা করবে? শুভ্র গাধাটা একটা বই নিয়ে কোণায় বসে আছে। এটা কি বই পড়ার সময়? বল্টু কম্বলে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে ঘুমুচ্ছে। সঞ্জুকে দেখেও মনে হচ্ছে না সে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশ ছুঁলে বত্রিশ ঘা — এই সত্য যে-কোনো বাচ্চাছেলেও জানে। এরা মনে হয় জানে না।

সঞ্জু বলল, রানা, ক'টা বাজে?

রানা জবাব দিল না। ফালতু কথা বলার সে কোনো প্রয়োজন দেখছে না। ক'টা বাজে এটা জেনে হবে কী?

'কথা বলছিস না কেন?'

'চুপ থাক গাধা।'

সঞ্জু বলল, তুই আমার উপর রাগ করছিস কেন? আমি কি তোদের এনে জেলে ঢুকিয়েছি?

'বললাম তো চুপ করে থাক।'

রানার কথাবার্তা বলতে ভাল লাগছে না। উদ্ধার পাওয়ার বুদ্ধি বের করতে হবে। মাথায় কোনো বুদ্ধি আসছে না। সবার আগে যা করতে হবে তা হল — থানাওয়ালার সঙ্গে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ আসা। যদি হাজতে রাত কাটাতে হয় — তা হলে কম্বল-টম্বল লাগবে। খাওয়াদাওয়া লাগবে। এইসব কাজে পয়সা খরচ করতে হয়।

রানা বলল, বল্টু ঘুমাচ্ছে নাকি? আশ্চর্য! সঞ্জু, বল্টুটাকে কানে ধরে তোল তো।

'কেন? ঘুমাচ্ছে ঘুমাক না। ট্রেনে সারা রাত ঘুম হয়নি।'

'তোল বললাম।'

'তুই এমন টেনশানে আছিস কেন? কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে বুঝতে পারছিস না?'

'না।'

'ভাল। তা হলে তুই আর শুধু শুধু জেগে আছিস কেন? তুইও ঘুমিয়ে পড়। আয়, আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমা।'

'শুধু শুধু টেনশান করে তো কোনো লাভ নেই।'

শুভ্র বই থেকে মুখ তুলে বলল, ওরা একটা ভুল করেছে। ভুলটা যখন ধরা পড়বে তখন লজ্জিত হয়ে আমাদের ছেড়ে দেবে।

রানা বলল, গাধার মতো কথা বলবি না শুভ্র। গাধামি কথা বন্ধ করে যা করছিস তাই কর। বই পড়। জ্ঞান বাড়া। কী বই এটা?

'ব্রিফ হিস্টরি অব টাইম। সময় ব্যাপারটা আসলে কী তা বলার চেষ্টা করা হয়েছে।'

মোতালেব কৌতূহলী হয়ে বলল, সময় ব্যাপারটা কী?

শুভ্র বেশ আগ্রহের সঙ্গে সময় কী তা বলতে শুরু করল। সঞ্জু এবং মোতালেব দু'জনই শুনছে। বেশ মন দিয়েই শুনছে।

রানা ভেবে পাচ্ছে না কেন সে একদল গাধাকে নিয়ে রওনা হল? এই বুদ্ধি কে তাকে দিল? সে ঠিক করেছে, এই ঝামেলা থেকে একবার বের হতে পারলে কানে হাত ধরে দশবার উঠ-বোস করবে। কোরান শরীফ হাতে নিয়ে পশ্চিম দিকে মুখ করে বলবে, আর কোনোদিন এই-জাতীয় দায়িত্ব নেবে না।

সেন্ট্রি-পুলিশ পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। রানা বলল, ভাই সাহেব, কাইন্ডলি একটু শুনবেন? ওসি সাহেবের সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা বলতে চাই — একটু কি বলবেন ওসি সাহেবকে?

'ওসি সাহেব চেয়ারে নাই।'

'চেয়ারে যখন আসবেন তখন কি বলবেন?'

'আচ্ছা দেখি।'

'দেখাদেখি নয় ভাই, এই কাজটা করতেই হবে। ছোট ভাই হিসেবে এটা আপনার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট, আবদার। আর শুনুন ভাই, একটু কাছে আসুন।'

সেন্ট্রি-পুলিশ কাছে এল।

রানা দলা পাকিয়ে একটা একশ' টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, রেখে দিন, পান খাবেন।

পান খাবার ব্যাপারে পুলিশের কোনো আপত্তি দেখা গেল না। রানা চোখ বন্ধ করে ভাবছে। পরিষ্কার কিছু ভাবতে পারছে না। মাথা জ্যাম হয়ে আছে। শুধু জ্যাম না — যন্ত্রণাও করছে। শুভ্র বকবক করেই যাচ্ছে —

'বস্তুর গতি যখন আলোর গতির সমান হয়ে যায়, তখন আইনস্টাইনের রিলেটিভিস্টিক সূত্র অনুযায়ী বস্তর ভর হয় অসীম। সূত্রটা হচ্ছে — এম ইকুয়েলস টু এম নট, স্কয়ার রুট অব . . .'

রানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এরা সুখেই আছে। কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। সে ঘড়ি দেখলো — এগারোটা বাজে। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা কেটে গেল হাজতে . . . । দেখতে দেখতে দুপুর হবে, তারপর সন্ধ্যা হবে, রাত হবে, সকাল হবে, আবার দুপুর হবে, আবার সন্ধ্যা . . .

রানার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। বাথরুমের বেগ প্রবল হয়েছে। আর চেপে রাখা যাচ্ছে না। এখন একবার যেতেই হবে। সে সেন্ট্রিকে হাসিমুখে ডাকল, এই যে পুলিশ সাহেব, পুলিশ সাহেব!

'কি হইছে?'

'একটু ভাই বাথরুমে যাওয়া দরকার।'

'টাট্টি করবেন?'

'জ্বি না। ছোটটা করব।'

'একটু আগেই তো করছেন। মিনিটে মিনিটে পিসাব করলে তো হবে না।'

রানা হতভম্ব হয়ে দেখল — সেন্ট্রি-পুলিশ চলে যাচ্ছে। অথচ তাকে একটু আগে পান খাওয়ার জন্যে একশ' টাকা দেয়া হয়েছে। রানা শুকনো মুখে সিগারেট ধরাল। বল্টু উঠে বসেছে। মনে হচ্ছে, সে চোখ বন্ধ করে মটকা মেরে পড়ে ছিল। বল্টু রানার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, রানা শোন, — বেগ খুব বেশি হলে এখানেই ছেড়ে দে। খামাখা রিকোয়েস্ট-ফিকোয়েস্ট করে লাভ কী? যে দেশের যে নিয়ম। ওদের টাইম টেবিল অনুযায়ী তো আর আমাদের পিসাব ধরবে না। কী আর করা।

রানা শুনেও না শোনার ভান করল। শুভ্র সমানে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে — আমাদের প্রচলিত ধারণা হল, সময় প্রবহমান। নদী যেমন প্রবাহিত হচ্ছে — সময়ও প্রবাহিত হচ্ছে। সময়ের প্রবাহ শুরু হয়েছিল সৃষ্টির আদিতে **at the time of Big Bang.** সেই প্রবাহ চলছে। নদীর প্রবাহ শেষ হয় সমুদ্রে — সময়ের প্রবাহের শেষ কোথায়? এখন ব্যাপারটা বোঝার জন্যে একটা কাজ করা যাক — একটা থট এক্সপেরিমেন্ট করা যাক . . .

রানার ইচ্ছা হচ্ছে, থাবড়া মেরে শুভ্রের বক্তৃতা বন্ধ করে দিতে। এই প্যাচাল বেশিক্ষণ শোনা সম্ভব না। সময়ের শুরু কোথায় হয়েছে তা দিয়ে কিছু যায় আসে না। তাদের সময়টা কীভাবে যাচ্ছে এটাই বড় কথা।

ব্লাডারের চাপ যে হারে বাড়ছে তাতে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে দু'টা ছোট ছোট এক্সপ্লোশান হবে এবং দু'টা ব্লাডারই ফেটে যাবে। মানুষের ব্লাডার ক'টা থাকে? দু'টা, না একটা? এই তথ্যটা শুভ্রের কাছ থেকে জেনে নেয়া দরকার। যে সময় নিয়ে এত প্যাচাল পাড়তে পারে সে নিশ্চয়ই মানুষের ব্লাডারের সংখ্যা জানে।

রানা করুণ গলায় ডাকল — পুলিশ সাহেব! ভাই, একটু কাইন্ডলি শুনে যান তো!

সেন্ট্রি অন্য দিকে তাকিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে। সে এখন মনে হয় কানেও শুনতে পারছে না। পান খাওয়ার জন্যে একশ' টাকা না দিয়ে দুশ' টাকা দেয়ার দরকার ছিল। অ্যামাউন্ট কম হয়েছে।

'এই যে ভাই, প্লীজ। ছোট্ট একটা কথা শুনে যান।'

সেন্ট্রি গভীর মনযোগে দাঁত খোঁচাচ্ছে। দাঁত খোঁচানো শেষ হলে নিশ্চয়ই কান খোঁচাবে। খোঁচাখুঁচি যাদের স্বভাব তারা স্থির থাকতে পারে না। তাদের সবসময় কিছু-না কিছু খোঁচাতে হয়।

রানা আবার করুণ গলায় ডাকল — পুলিশ সাহেব! ব্রাদার। একটু শুনবেন?



মনিরুজ্জামান ওসি সাহেবের সামনে বসে আছে। মনিরুজ্জামানের গায়ে থ্রী পিস স্যুট, লাল টাই। কোটের বাটন হোলে পাতাসহ গোলাপের কুঁড়ি। গোলাপটা ঠিক আছে — পাতা দু'টি মরে গেছে। মনিরুজ্জামানের মুখে তেলতেলে ভাব হাসি। সে আজ সারা দিনে প্রচুর পান খেয়েছে বলে মনে হয়। দাঁত খয়েরি বর্ণ ধারণ করেছে। ঠোঁট দু'টিও লাল। মনিরুজ্জামানের হাতে সাদা রুমাল। কিছুক্ষণ পরপর ঠোঁট মোছার জন্যে রুমাল ব্যবহার করতে হচ্ছে।

মনিরুজ্জামানের পাশে আছে হারুনুর রশীদ। হারুনুর রশীদের কাজ হচ্ছে মনিরুজ্জামানকে ছায়ার মতো অনুসরণ করা। হারুনুর রশীদ পাতলা একটা পাঞ্জাবি পরে আছে। নিচে গেঞ্জি নেই বলে পাঞ্জাবির ভেতর দিয়ে তার লোমভর্তি বুক দেখা যাচ্ছে। হারুনুর রশীদের মুখ খুব গম্ভীর। সেই তুলনায় মনিরুজ্জামানের মুখ হাসি-হাসি।

মনিরুজ্জামান বলল, তারপর ওসি সাহেব, ভাই, কেমন আছেন বলেন দেখি।

'জ্বি, ভাল আছি।'

'সকালে চলে আসতাম — ফার্স্ট ফ্লাইট পেলাম না। গাড়িতে রওনা হলে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকাল হবে। সেকেন্ড ফ্লাইটে এসেছি।'

'ভাল করেছেন।'

'আমি এসেই আপনার বিষয়ে খোঁজখবর করেছি। খবর যা পেয়েছি তাতে মনটা ভাল হয়েছে। আমি হারুনুর রশীদকে বললাম, এরকম অফিসার যদি দশটা থাকে, তাহলে দেশ ঠিক হয়ে যায়। কী হারুন, বলি নাই?'

হারুন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

মনে হচ্ছে সে কথা কম বলে। কিংবা মাথা নাড়াই তার চাকরি।

'দেশের আজ যে অবস্থা তা কিন্তু দেশের জনগণের জন্যে না। খারাপ অফিসারের জন্যে। জনগণ কখনো ভুল করে না।'

'আপনি আমার বিষয়ে কী খোঁজ পেয়েছেন?'

'সব খোঁজই পেয়েছি ভাই। প্রদীপ জ্বলে উঠলে দূর থেকে টের পাওয়া যায় — আলো দেখা যায়। বুঝলেন রহমান সাহেব, আমি খবর পেয়েছি, আপনি অত্যন্ত

অনেস্ট অফিসার। ঘুষ খান না। অন্যায় করেন না। ঠিক শুনি নাই রহমান সাহেব?'

'জ্বি, ঠিকই শুনেছেন।'

'আপনার নাম রহমান তো?'

'আব্দুর রহমান আমার নাম।'

'এতবড় একটা কাজ যে আপনি করলেন, অনেস্ট অফিসার বলেই করতে পারলেন। ঘুষ-খায় অফিসারের আত্মা থাকে ছোট — সাহস থাকে না। কী হারুন, আমি এই কথা বলি নাই?'

হারুন আবার হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল।

মনিরুজ্জামান গলা নিচু করে বলল, এত বড় একটা কাজ সুন্দরভাবে করার জন্যে আমি ছোটভাই হিসাবে আপনাকে সামান্য উপহার দিতে চাই। না করবেন না। না করলে মনে ব্যথা পাব।

মনিরুজ্জামান হারুনুর রশীদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। হারুনুর রশীদ ব্রীফকেস খুলে ব্রাউন পেপারের একটা মোটা মোড়ক ওসি সাহেবের ফাইলের কাছে রেখে ভারী গলায় বলল — ফিফটি আছে।

ওসি সাহেব বললেন, ফিফটি কি?

'ফিফটি থাইজেন্ড স্যার।'

মনিরুজ্জামান বলল, উপহার কী কিনব, কী আপনার পছন্দ, তা তো জানি না। এই জন্যেই ক্যাশ। পছন্দমত একটা-কিছু কিনে নেবেন ভাই সাহেব। ছোট ভাইয়ের উপর মনে কিছু নিবেন না।

'আচ্ছা।'

'বুঝলেন ভাই সাহেব, খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। আপনি রাগই করেন কি না। উপহার এক জিনিস আর ঘুষ ভিন্ন জিনিস।'

'তা তো বটেই।'

'এখন ভাই সাহেব, মেয়েটাকে বের করে দেন — ঢাকায় নিয়ে যাই।'

'মেয়েটাকে বলছেন কেন? বলুন স্ত্রীকে বের করে দিন।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। অল্পদিন হয়েছে বিয়ে, এখনো অভ্যস্ত হইনি। যাই হোক, আমি স্ত্রীকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার স্ত্রীর যে বড় চাচা উনিও আসছেন। বাই রোডে আসছেন।'

ওসি সাহেব শান্ত গলায় বললেন, ব্যাপারটা আপনি যত সহজ ভাবছেন তত সহজ না। সামান্য জটিলতা আছে।

কী জটিলতা? মনিরুজ্জামান চোখ সরু করে বলল।

'আপনার স্ত্রী জবানবন্দি দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে বিয়ে হয়নি। যে রাতে বিয়ে

হবার কথা সেই রাতে উনি পালিয়ে গেছেন।'

'ও বললে তো হবে না। ও তো এখন এরকম বলবেই। আরো যে জঘন্য কিছু বলে নাই সেটাই আমার সৌভাগ্য। বিয়ে যে হয়েছে তার কাগজপত্র আছে। দেখতে পারেন। হারুন, কাবিননামাটা দেখাও তো।'

হারুন ব্রীফকেস খুলে কাবিননামা বের করল।

মনিরুজ্জামান বলল, খুব ভাল করে দেখেন। আমার স্ত্রীর দস্তখত আছে। দেখতে পচ্ছেন?

'জ্বি।'

'চারজন সাক্ষি আছে। সাক্ষি কারা এইটাও একটু লক্ষ করুন। আপনারা পুলিশের লোক, কিছুই আপনাদের চোখ এড়াবে না। তবু মনে করিয়ে দেয়া। একজন আছেন মিনিস্টার, প্রতিমন্ত্রী না, আসল মন্ত্রী। একজন আর্মির ব্রিগেডিয়ার, একজন হচ্ছেন ইউনিভার্সিটির ফুল প্রফেসর। আরেক জন বিশিষ্ট শিল্পপতি এ আর খান। নাম শুনেছেন আশা করি।

'বলেন কী! এঁরা সবাই কি আপনার আত্মীয়?

'জ্বি না। তবে পরিচিত।'

'সাধারণত দেখা যায়, বিয়েতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনরা সাক্ষি হয়। আপনার বেলাতেই ব্যতিক্রম দেখলাম।'

'আমার সবই ব্যতিক্রম। দেখলেন না — বৌকে বিয়ের পরেই ভাগিয়ে নিয়ে চলে গেল। তবে হজম করতে পারে নাই — বদহজম হয়ে গেছে। হা-হা-হা।'

'আপনাকে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে।'

'অবশ্যই আনন্দিত। আম ছালা সব ধরা পড়ে গেছে। সাথের বদগুলোকে মাইল্ড পিটন দিয়েছেন তো?'

'জ্বি না, দেই নাই। ভদ্রলোকের ছেলেপুলে, পিটন দিয়ে শেষে কোন বিপদে পড়ি!'

'কোনো বিপদে পড়বেন না। আমি তো আছি আপনার পিছনে। অমি মানুষটা ছোটখাট কিন্তু আল্লাহ্‌র দয়ায় আমার যোগাযোগ ভাল।'

'সেটা বুঝতে পারছি।'

'অনেকেই বুঝতে পারে না। প্রয়োজন বোধ করলে হেভি পিটন দিয়ে দেন। এদের চুরির মামলায় ফেলে নাকানি-চুবানি খাওয়ানো যায় ন? আমার স্ত্রীর গায়ে চার লাখ টাকার জড়োয়া গয়না ছিল — এই মামলা . . . ধান দেখেছে, বুলবুলি দেখে নই। এইবার বুলবুলি দেখবে। ছোট্ট বুলবুলি।'

হারুনর রশীদ বলল, স্যার, আপনি কাইন্ডলি বেগম সাহেবকে রিলিজ করে

দেন। আমরা ঢাকার দিকে রওনা হয়ে যাই। বেলাবেলি পৌঁছতে হবে।

'এত সহজে তো ভাই হবে না। মামলা করেছেন, আমরা আসামী কোর্টে চালান দেব। কোর্ট যা করার করবে।'

'সে কী?'

'আপনি মামলা করেছেন ঢাকায় — আমরা আসামী ঢাকা পাঠাব।'

'তা হলে এত যন্ত্রণার প্রয়োজন নাই। মামলা তুলে নিব। আপনি আমার স্ত্রীকে শুধু রিলিজ করে দিন।'

'সেটাও সম্ভব না। একটা বেড়াছেড়া লেগে যাবে বলে মনে হয়।'

'কী বেড়াছেড়া?'

'যাদের থানা হাজতে আটকে রেখেছি তারা এত সহজে ছেড়ে দেবে তা মনে হয় না।'

'যারা আমার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে ওদের উপর আমার কোনো রাগ নাই। ছেলেমানুষ ভুল করেছে। মানুষমাত্রই ভুল করে। তা ছাড়া সমস্যাটা মূলত তৈরি করেছে আমার স্ত্রী। কাজেই শাস্তি যা দেবার আমি আমার স্ত্রীকেই দেব। আপনি ওদের ছেড়ে দিন। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাই।'

'আপনি বিকেলে আসুন।'

'বিকেলে আসব কেন?'

'আমি আসতে বলছি এইজন্যে আসবেন।'

'ওসি সাহেব, আপনি তো ঝামেলা করছেন। আমি ঝামেলা পছন্দ করি না।'

'ঝামেলা আমিও পছন্দ করি না। মহিলাকে আমি ছেড়ে দিলাম, আপনিও গাড়িতে করে জোর করে নিয়ে গেলেন, পরে দেখা গেলো আসলেই আপনাদের বিয়ে হয়নি।'

'কাগজপত্র দেখালাম না?'

'কাগজপত্রের দাম নাই।'

'মনিরুজ্জামান হতভম্ব হয়ে বলল, কাগজপত্রের দাম নাই — কী বলেন আপনি!'

'মনিরুজ্জামান সাহেব, পুলিশে কাজ করছি দশ বছর ধরে — এই দশ বছরে একটা জিনিস শিখেছি — মানুষের চেয়ে বেশি মিথ্যা বলে কাগজ।'

'সিগনেচার আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'জ্বি না।'

'আমি কিন্তু জানি কী করে বিশ্বাস করাতে হয়। বিশ্বাস করাবার মতো ব্যবস্থা নিয়ে আসব।'

'আসুন। বিশ্বাস করাতে পারলে আমি ওনাকে ছেড়ে দেব। আপনি নিয়ে চলে যাবেন। শাস্তি দিতে চাইলে দেবেন। পথেই কোথাও গলা টিপে মেরে ফেলতে পারেন। আপনার সমস্যা হবে না। ডাক্তাররা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আপনার কথামত দেবে। পুলিশও ফাইন্যাল রিপোর্ট যা চাইবেন তাই দেবে।'

'শুধু আপনি দিবেন না?'

'জ্বি না।'

'কেন দিবেন না?

'কারণ আমি মানুষটা খারাপ।'

'আমি ঠিক এক ঘণ্টা পরে আসব।'

'এক ঘণ্টা পরে এলে হবে না। আপনাকে বিকেলে আসতে বলেছি — আপনি বিকেলে আসবেন।'

'হাতি ঘোড়া গেল তল, চার পয়সার ওসি বলে কত জল?'

ওসি সাহেব হাই তুললেন। মনিরুজ্জামান বলল, মেয়েটা কোথায়? আমি ঐ মেয়েটার সঙ্গে কথা বলব। নাকি আমাকে কথাও বলতে দেবেন না?

'দেব। কথা বলতে দেব।'

মনিরুজ্জামান হারুনুর রশীদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল।

হারুনুর রশীদ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্রাউন পেপারের প্যাকেট হাতে নিয়ে ঝট করে ব্রীফকেসে ভরে ফেলল। কাজটা সে করল দেখার মতো দ্রুততায়।

পাগলী নতুন শাড়ি পরেছে। মাথায় চুল আঁচড়েছে। তাকে আর চেনা যাচ্ছে না। সে নিজেও মনে হয় হকচকিয়ে গেছে। চুপচাপ বসে আছে, কোনোরকম হৈচৈ করছে না। কিছুক্ষণ পরপর নিজের দু'টা হাত তার চোখের সামনে ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কী যেন দেখছে। জরী বলল, তুমি কী দেখ?

পাগলী হাসল।

'নাম কী তোমার?'

পাগলী জবাব দিল না।

'তোমার কি শাড়িটা পছন্দ হয়েছে?'

পাগলী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল এবং আবারও তার দু'টা হাত চোখের সামনে মেলে ধরল।

মুনা বলল, জরী আপা, মেয়েটাকে কী সুন্দর লাগছে দেখছেন?

'হুঁ, দেখছি।'

'এত সুন্দর একটা মেয়ে পথে পথে ঘোরে! আশ্চর্য!'

নইমা শুয়ে আছে। কম্বল বিছানো হয়েছে। কম্বলের উপর ফুলতোলা নতুন চাদর। নতুন বালিশ। সবই কিনে আনানো হয়েছে। নইমা বালিশে মাথা রেখেই ঘুমুচ্ছে। তার জ্বর এসেছে। মুনা বসে আছে নইমার মাথার কাছে।

আনুশকা বলল, ওর জ্বর কি বেশি মুনা?

'হুঁ।'

'সমস্যা হয়ে গেল তো!'

'আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না আপা কোনো সমস্যা আছে। শান্তমুখে বসে আছেন।'

আনুশকা হাসল। মুনা বলল, আপা, আমাদেরকে কি ওরা এখানে রাতেও আটকে রাখবে?

'না, ছেড়ে দেবে। সন্ধ্যার আগেই ছেড়ে দেবে।'

'কীভাবে বলছেন?'

'আমাদের সঙ্গে শুভ্র আছে না? শুভ্রর কোনো সমস্যা তার বাবা-মা হতে দেবেন না।'

'ওনারা তো আর জানেন না এখানে কী হচ্ছে।'

'ইতিমধ্যে জেনে গেছেন বলে আমার ধারণা। তাঁরা তাঁদের ছেলের উপর লক্ষ রাখবেন না, তা হয় না।'

আনুশকার কথার মাঝখানেই মনিরুজ্জামান এসে দাঁড়াল। জরী হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। ভূত দেখলেও কেউ এত চমকায় না।

মনিরুজ্জামান বলল, খেল তো ভাল দেখালে। যাই হোক, এখন সমস্ত খেলার অবসান হয়েছে। বিকেলে তোমাকে নিয়ে ঢাকা রওনা হব।

'আমাকে নিয়ে ঢাকা রওনা হবেন মানে? আমি আপনার সঙ্গে ঢাকা যাব কেন?'

'স্বামীর সঙ্গে কোথাও যাবে না, এটা কেমন কথা?'

'আপনি আমার স্বামী?'

'অবশ্যই। বিয়ের কাবিননামাও নিয়ে এসেছি। ওসি সাহেবকে দেখালাম।'

'বিয়ের কাবিননামা?'

'এক লাখ এক টাকা কাবিনের কাবিননামা। বিকেলের মধ্যে তোমার বড় চাচাও চলে আসবেন।'

জরীর মুখে কথা আটকে গেল। কী-একটা কথা অনেক বার বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

মনিরুজ্জামান হৃষ্ট গলায় বলল, আচ্ছা যাই — দেখা হবে বিকেলে।

জরী তাকাল আনুশকার দিকে। আনুশকা হাসছে। আনুশকার হাসি দেখে পাগলীও হাসতে লাগল। এতে নইমার ঘুম ভেঙে গেলো। সে উঠে বসল এবং আনন্দিত গলায় বলল, কী হয়েছে? কী হয়েছে?

মনিরুজ্জামান আর দাঁড়াল না। তার অনেক কাজ বাকি আছে। কাজ শেষে করতে হবে। নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। ওসির স্ক্রু টাইট দিতে হবে, তবে যাবার আগে দলের ছেলেগুলিকে দেখে যাওয়া দরকার।

রানা দেখল, থ্রী পিস স্যুটপরা এক ভদ্রলোক আসছেন। সে উৎসাহের সঙ্গে উঠে বসল। মনে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কেউ আসছে। তাদের মুক্তির ব্যবস্থা হচ্ছে। রানাই আগ বাড়িয়ে বলল, স্লামালিকুম।

মনিরুজ্জামান বলল, ওয়ালাইকুম সালাম। আপনারা ভাল?

'জ্বি স্যার, আছি মোটামুটি।'

'কষ্ট হয়নি তো?'

মোত্তালেব বলল, কোনো কষ্ট হয়নি। অত্যন্ত আনন্দে সময় কাটিছে। 'সময়' কি ব্যাপার আগে জানতাম না। এখন জানি। আরো বৎসরখানেক এখানে থাকতে পারলে সায়েন্সের অনেক কিছু শিখতাম। আপনাকে তো ভাই চিনতে পারছি না — আপনার পরিচয়?

'আমার নাম মনিরুজ্জামান। আমি জরীর হাসবেন্ড।'

'কার হাসবেন্ড?'

'জরীর। আমি তাকে নিতে এসেছি। বিকেলে ওকে নিয়ে চলে যাব। আপনারা যেখানে যাচ্ছেন চলে যান। আপনাদের উপর আমার কোনো রাগ নেই। আপনাদের একটু সমস্যা হল — তার জন্যে আমার স্ত্রীর হয়ে আমি আপনাদরে কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

রানা বলল, কী বললেন? আপনি কে?

'জরীর হাসবেন্ড।'

শুভ্র বিস্মিত হয়ে বলল, জরী তো বিয়ে করেনি!

মনিরুজ্জানান হাসিমুখে বলল, আপনাদের তাই বুঝিয়েছে, ঘটনা ভিন্ন। বিয়ে হয়েছে, কাবিন হয়েছে। এক লক্ষ এক টাকা মোহরানা। যাই, কেমন? খোদা হাফেজ।

মনিরুজ্জামান হনহন করে এগুচ্ছে। তার পেছনে হারুনুর রশীদ। হারুনুর রশীদ যে এতটা লম্বা তা আগে বোঝা যায়নি। এখন বোঝা যাচ্ছে। তাকে দেখে মনে

হচ্ছে, একটা তালগাছ ব্রীফকেস হাতে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দলের সবাই খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। সঞ্জু বলল, অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। শুভ্র, তুই কি একটা কাজ করবি?

'কী কাজ?'

'তুই তোর বাবাকে টেলিফোন করে ঘটনাটা বলবি? জরীকে একটা লোক জোর করে ধরে নিয়ে চলে যাবে — আর আমরা যাব দারুচিনি দ্বীপে! তা কী করে হয়?'

শুভ্র চুপ করে আছে। সঞ্জু বলল, কথা বলছিস না কেন?

'বাবাকে কী বলব?'

'তোর কিছু বলতে হবে না। তোর বাবাই তোর ভেতর থেকে সব কথা টেনে বের করে নিয়ে আসবেন।'

শুভ্র অস্বস্তির সঙ্গে চুপ করে আছে। রানা রাগী ভঙ্গিতে বলল, তুই এমন স্টোন ফেস হয়ে গেলি কেন? বাবার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা লাগছে?

শুভ্র বলল, বাবাকে কিছু বলার দরকার নেই।

'বলার দরকার নেই কেন?'

'আমার ধারণা বাবা সবই জানেন।'

'গাধার মতো কথা বলবি না শুভ্র। তোর বাবা কোনো পীর-ফকির না যে সব জানে। তোকে টেলিফোন করতে বলা হয়েছে, তুই টেলিফোন করবি এবং কাঁদো-কাঁদো গলায় বলবি, আমাদের রক্ষা করো। এস ও এস। বাঁচও বাঁচাও।'

'এরা কি আমাদের টেলিফোন করতে দেবে?'

'এইটা একটা টেকনিক্যাল কথা বলেছিস। তোকে টেলিফোন করতে দেবে কি না সেটা হচ্ছে কথা। সম্ভবত দেবে না — তবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।'

বল্টু বলল, প্রয়োজনে আমি ওসি সাহেবের পা চেপে ধরব। অনেক ধরনের মানুষের পা ধরেছি, পুলিশের পা কখনো ধরিনি। পা ধরে সবচে' বেশি মজা কখন পেয়েছিলাম জানিস? একবার এর পীর সাহেবের পা ধরেছিলাম — কী মোলায়েম পা! ধরলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না।

শুভ্র ওসি সাহেবের সামনে বসে আছে। ওসি সাহেব টেলিফোন সেট তার দিকে বাড়িয়ে বললেন, নিন, টেলিফোন করুন।

শুভ্র বিব্রত মুখে বলল, আমি নাম্বার ভুলে গেছি।

'নাম্বার ভুলে গেছেন মানে? নিজের বাসার নাম্বার মনে নেই?'

'জ্বি না। বাসায় তো কখনো টেলিফোন করা হয় না। তবে আমার হ্যান্ডব্যাগের পকেটে একটা ডায়েরি আছে — সেখানে নাম্বার লেখা আছে।'

'আচ্ছা, হ্যান্ডব্যাগ আনিয়ে দিচ্ছি।'

শুভ্র ডায়েরির জন্যে অপেক্ষা করছে। ওসি সাহেব কৌতূহল এবং আগ্রহ নিয়ে শুভ্রকে দেখছেন।

টেলিফোন ধরলেন শুভ্রর মা। শুভ্র বলল, মা, কেমন আছ?

রাহেলা প্রায় হাহাকার করে উঠলেন, তুই কেমন আছিস বাবা?

'ভাল।'

'তোর চশমা! তোর চশমা আছে?'

'হুঁ, আছে।'

'খাওয়াদাওয়ার কি কোনো সমস্যা হচ্ছে?'

'না, কোন সমস্যা হচ্ছে না।'

'বাইরের পানি খাচ্ছিস না তো?'

'উঁহু।'

'একসঙ্গে বেশি করে পানির বোতল কিনে নে।'

'আচ্ছা মা, নেব।'

'গত রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?'

'হুঁ।'

'এদিকে আমি সারা রাত ঘুমুতে পারিনি। শুধু দুঃস্বপ্ন দেখেছি। শুভ্র, তুই ভাল আছিস তো?'

'আমি ভাল আছি মা।'

'তোর বন্ধুরা? ওরা ভাল আছে তো?'

'হ্যাঁ, ওরাও ভাল আছে। আচ্ছা মা, বাবা কি অফিসে, না বাসায়?'

'তোর বাবা বাসায়। আজ কোথাও যায়নি। ওর শরীরটা নাকি ভাল না।'

বাবা কী করছেন?

'বিছানায় শুয়ে শুয়ে রেস্ট নিচ্ছে। বই পড়ছে।'

'কী বই পড়ছেন মা?'

'কী বই পড়ছে তা তো দেখিনি — দেখে আসব?'

'না, তুমি বাবাকে দাও।'

'তুই আমার সঙ্গে আরেকটু কথা বল শুভ্র। তারপর তোর বাবাকে দেব।'

'উঁহু, তুমি আগে বাবাকে দাও। তারপর আমি আবার তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'তুই কি আমাকে মিস করছিস শুভ্র?'

'হুঁ। মা, তুমি বাবাকে দাও।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব টেলিফোন-রিসিভার হাতে নিয়ে ভারী গলায় বললেন,

হ্যালো।

শুভ্র বলল, বাবা, তুমি কী বই পড়ছ? তোমার হাতে এখন কী বই?

'বইটার নাম হল "Moon is down".

শুভ্র খুশি-খুশি গলায় বলল, তুমি আমার টেবিল থেকে বইটা নিয়েছ, তাই না?

'হুঁ।'

'এটা তোমার জন্মদিনে দেব বলে আনিয়ে রেখেছিলাম। প্যাকেট করা বই তুমি খুললে কেন? না বলে প্যাকেট খোলা তো নিষেধ।'

'মানুষের প্রকৃতি এমন যে সে সবসময় নিষেধ অমান্য করে।'

'বইটা তোমার কেমন লাগছে বাবা?'

'ভাল, খুব ভাল।'

'তোমার কি চোখে পানি এসেছে?'

'এখনো আসেনি।'

'পঞ্চাশ পৃষ্ঠার পর থেকে দেখবে — একটু পরপর চোখ ভিজে উঠেছে। তুমি ক' পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছ?'

'কুড়ি-পঁচিশ পৃষ্ঠা হবে।'

'বাবা, তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কয়েকটা কথা আছে।'

'এখন তুমি ছুটি কাটাতে গেছ, এখন আবার জরুরি কথা কী? এখন শুধু হালকা কথা বলবে।'

'কথাটা খুব জরুরি বাবা।'

'আমি তোমার কোনো জরুরি কথা শুনতে চাচ্ছি না।'

'বাবা, আমরা খুব বিপদে পড়েছি।'

'মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ, বিপদে তো পড়বেই। বিপদে পড়বে, আবার বিপদ থেকে বের হয়ে আসবে। আবার পড়বে। দিস ইজ দ্যা গেম।'

'পুলিশ আমাদের ধরে এনে হাজতে রেখে দিয়েছে।'

'ও, আচ্ছা।'

আমাদের সঙ্গে জরী নামের যে মেয়েটি আছে — তার হাসবেন্ড এসেছে তাকে নিয়ে যেতে।'

'হাসবেন্ড নিয়ে যেতে চাইলে তো তোমরা কিছু করতে পারবে না। পুরুষ-শাসিত সমাজে স্বামীর অধীকার স্বীকৃত।'

'লোকটির সঙ্গে জরীর বিয়ে হয়নি। লোকটা মিথ্যা কথা বলছে। মিথ্যা কথা বলে মেয়েটিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।'

'উল্টোটাও তো হতে পারে। হয়তো মেয়েটাই মিথ্যা বলছে। মেয়েরা পুরুষদের চেয়েও গুছিয়ে মিথ্যা বলতে পারে। একজন পুরুষ যখন মিথ্যা কথা বলে তখন বোঝা যায় সে মিথ্যা বলছে। কিন্তু একটা মেয়ে যখন মিথ্যা বলে তখন বোঝার কোনো উপায়ই নেই সে মিথ্যা বলছে।'

'তুমি খুবই অদ্ভুত কথা বলছ বাবা।'

'এটা আমার কথা না। যে বইটা এই মুহূর্তে আমি পড়ছি সেই বইয়ের নায়ক বলছে , তোর প্রিয় বই Moon is down-এই এটা লেখা।'

'ঐ লোকটা একটা ফ্রড বাবা। ওর প্রতিটি কথাই মিথ্যা।'

'ও, আচ্ছা।'

'বাবা শোনো — আমরা ভয়ংকর বিপদে পড়েছি। তুমি কি কিছু করতে পার আমাদের জন্যে?'

'না।'

'না কেন?'

'আমি তোমাকে বিপদে ফেলিনি, কাজেই বিপদ থেকে তোমাকে টেনে তোলার দায়িত্বও আমার নয়। তুমি স্বাধীনতা চেয়েছ, তোমাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে রওনা হয়েছ । এখন তুমি হুট করে আমার সাহায্য চাইতে পার না।'

শুভ্র চুপ করে রইল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, তা ছাড়া আমি সারা জীবন বেঁচে থাকব না। এ জীবনে আমি যা সঞ্চয় করেছি সেইসব রক্ষার দায়িত্ব তোমার। আজ যদি এই সামান্য বিপদ থেকে নিজের চেষ্টায় বের হতে না পার, তা হলে ভবিষ্যতে বড় বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে কী করে? বুঝতে পারছ আমি কী বলছি?

'পারছি।'

'যখন কোনো সমস্যা আসবে তখন সমস্যাটাকে একটা বস্তুর মতো তোমার সামনের টেবিলে রাখবে। নানান দিক থেকে সমস্যাটা দেখবে। একসময় লক্ষ করবে সমস্যাটার একটা দুর্বল দিক আছে। তুমি আক্রমণ করবে দুর্বল দিকে।'

'আমার সমস্যার দুর্বল দিক কোনটা বাবা?'

'যে লোক সমস্যা তৈরি করেছে, মেয়েটির হাসবেন্ড বলে যে নিজেকে দাবি করছে সেই সবচে' দুর্বল। সে দুর্গ তৈরি করেছে মিথ্যার উপর। এ-জাতীয় লোকেরা ভীতু প্রকৃতির হয়। এদের ভয় দেখালে ওরা অসম্ভব ভয় পায়। এদের ভয় দেখাতে হয়। ছোটখাট ভয় না। বড় ধরনের ভয়।'

'ভয় কীভাবে দেখাব?'

'সেটা তুমি জান কীভাবে ভয় দেখাবে।'

'আমি ভয় দেখালেই সে ভয় পাবে কেন?'

'তুমি ভয় দেখালে সে ভয় পাবে, যদি সে জানে তুমি কে। তোমার ক্ষমতা কী?'

'বাবা, আমার তো কোনো ক্ষমতা নেই?'

'তোমার ক্ষমতা হচ্ছে তোমার অর্থ। তোমার সঙ্গে চেকবই আছে না?'

'জ্বি, আছে।'

'তুমি যদি চেকবই বের করে এক কোটি টাকার একটা চেক লিখে দাও, সেই চেক ফেরত আসবে না। ব্যাংক সেই চেক অনার করবে। এইখানেই তোমার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা দিয়ে তুমি যে-কোনো মানুষকে ভয় দেখাতে পার।'

'কিন্তু বাবা, এই ক্ষমতা তো মিথ্যা ক্ষমতা।'

'হ্যাঁ, এই ক্ষমতা মিথ্যা। কোনো ক্ষমতাবান লোকই এই ব্যাপারটা জানে না। তুমি জান। **That's the best thing about you.** শুভ্র, অনেকক্ষণ কথা হল, এখন টেলিফোন রাখি?'

'তুমি আর কিছু বলবে না বাবা?'

'হ্যাঁ, বলব। **I love you my son.** এবং তুমি তোমার "মুন ইজ ডাউন" বইটিতে আমার সম্পর্কে যে উক্তি করেছ তা আমি পড়েছি। থ্যাংক য়্যু।'

ইয়াজউদ্দিন টেলিফোন নামিয়ে রেখে হাতের বই খুললেন। প্রথম পাতায় শুভ্র সবুজ কালি দিয়ে লিখে রেখেছে —

> বাবা,
> জন্মদিন শুভেচ্ছা।
> আমার খুব ইচ্ছা করে আমি তোমার মতো হই।
>
> শুভ্র।

ইয়াজউদ্দিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন, শুভ্র শুভ্রর মতোই থাকুক। ওকে আমার মতো হতে হবে না।

রাহেলা বললেন, তুমি টেলিফোন রেখে দিলে কেন? আমি শুভ্রের সঙ্গে কথা বলতাম।

'স্যরি। আমি আবার যোগাযোগ করে দিচ্ছি।'

'না লাগবে না।'

রাহেলার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখ মুছছেন।

ওসি সাহেব বললেন, শুভ্র সাহেব, আপনার টেলিফোনের কথা তো শেষ হয়েছে।

'জ্বি।'

'কী বললেন আপনার বাবা?'

'বাবা আমাকে মনিরুজ্জামান নামের ঐ লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বললেন।'

'কথা বলবেন?'

'জ্বি, কথা বলব।'

'উনি চলে এসেছেন। আমি ডেকে দিচ্ছি। আপনারা কথা বলুন। নিরিবিলি কথা বলুন।'

'ওসি সাহেব, আপনিও থাকতে পারেন।'

মনিরুজ্জামান এসে বসল শুভ্রর সামনের চেয়ারে। মনিরুজ্জামানের পাশে বসেছে হারুনুর রশীদ। সে কৌতূহলী হয়ে শুভ্রকে দেখছে।

শুভ্র বলল, স্লামালিকুম।

'ওয়ালাইকুম সালাম। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি ভাই। আপনি ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ছেলে। বাহ্, ভাল। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। ছি ছি, এটা তো বিরাট লজ্জার ব্যাপার হয়ে গেল, ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ছেলে কিনা হাজতে! ইয়াজউদ্দিন সাহেবের কাছে তো মুখ দেখাতে পারব না।'

শুভ্র বলল, আপনি আমাদের এই ঝামেলা দূর করবেন, আশা করি।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আমি ওসি সাহেবকে বলে দিয়েছি। আপনাদের উপর থেকে যত চার্জ ছিল সব তুলে নেয়া হয়েছে। আপনারা আপনাদের মতো বেড়াতে যাবেন। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে যাব।'

'জরীও আমাদের সঙ্গে যাবে।'

'কী বললেন?'

শুভ্র শান্তমুখে বলল, আপনি যথেষ্ট যন্ত্রণা করেছেন। তার পরেও আপনাকে ক্ষমা করেছি। এরচে' বেশি যন্ত্রণা করার চেষ্টা করলে ক্ষমা করব না।

'কী করবেন?'

'আপনি জীবিত ঢাকা ফিরবেন না।'

'কী বললেন?'

'এই বাক্যটি আমি দ্বিতীয়বার বলব না। তবে যে বাক্যটি বলা হয়েছে — তা কার্যকর করার সমস্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই তথ্যটা আপনার জানা থাকা দরকার।'

শুভ্র উঠে দাঁড়াল। মনিরুজ্জামান বলল, আরে বসেন, বসেন। রাগ করে উঠে যাচ্ছেন কেন? চা খান। ওসি সাহেব, আমাদের একটু চা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন-না রে ভাই।

শুভ্র বলল, আমি চা খাই না।

মনিরুজ্জামান হাত ধরে টেনে তাকে বসিয়ে ফেলল। হাসিমুখে বলল, আমাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি থাকবে এটা কেমন কথা? আমরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে . . .

'এখানে আলাপ-আলোচনার কিছু নেই।'

'আচ্ছা, না থাকলে নাই। চা তো খাওয়া যাবে। আমার সঙ্গে চা খেতে তো অসুবিধা নেই?'

'অসুবিধা আছে।'

ওসি সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, শুভ্র সাহেব, ঢাকা থেকে আপনার কাছে এক ভদ্রলোক এসেছেন। রফিক নাম। উনি থানার বাইরে অপেক্ষা করছেন। আপনি কি ওনার সঙ্গে কথা বলবেন?

শুভ্র বলল, ওনাকে অপেক্ষা করতে বলুন।

মনিরুজ্জামানের মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। সে পরপর দু'বার ঢোক গিলল।

শুভ্র দেখল তার বাবার কথাই ঠিক হয়েছে। ভয় কাজ করছে।



থানার সামনে পর্যটনের এসি বসানো মাইক্রোবাস অপেক্ষা করছে। মাইক্রোবাসের পেছনে একটি পাজেরো গাড়ি। পাজেরোতে সুলেমান অপেক্ষা করছে। সে টেকনাফ পর্যন্ত যাবে। সুলেমানের সঙ্গে আরো দু'জন। এই দু'জনের চোখ ছোট ছোট, হাব-ভাব কেমন কেমন। এরা কখনো চোখে চোখে তাকায় না। কথা বলে মাটির দিকে তাকিয়ে। দু'জনের গায়েই চামড়ার জ্যাকেট। থানার বারান্দায় রফিক সাহেবও হাঁটাহাঁটি করছেন।

শুভ্র বের হতেই রফিক সাহেব এগিয়ে গেলেন। শুভ্র বলল, আপনি এখানে?

রফিক সহজভাবে বললেন, চিটাগাং-এ একটা কাজ ছিল — এসেছিলাম। আজই ঢাকা ফিরে যাব। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই। স্যারকে কিছু বলতে হবে?

'না, কিছু বলতে হবে না।'

'আপনারা কি আজ রাতটা চিটাগাং থাকবেন? না কি রাতেই কক্সবাজার চলে যাবেন?'

'বুঝতে পারছি না। আমার বন্ধু রানা এইসব দেখছে। সে যা ঠিক করে, তাই।'

'সুলেমান একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমার মনে হয় সেইটাই ভাল ব্যবস্থা হবে। ছোটখাট সমস্যা যেহেতু হচ্ছে . . .'

'কী ব্যবস্থা?'

'পর্যটনের মাইক্রোবাস যাবে। আপনারা সবাই বেশ আরাম করে যেতে পারবেন। পেছনে পেছনে সুলেমান যাবে পাজেরো জীপ নিয়ে। দু'জন বডিগার্ডও আছেন। এ ছাড়াও এসপি সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি পুলিশ এসকর্টের ব্যবস্থা করেছেন। পুলিশের একটা জীপ আগে আগে যাবে। টেকনাফ পর্যন্ত যাবে। আমি বলছি কি — আপনারা সবাই খাওয়াদাওয়া করে মাইক্রোবাসে উঠে বসুন এবং এক টানে চলে যান টেকনাফ। এটাই সবচে' ভাল বুদ্ধি।'

'ভাল বুদ্ধি মন্দ বুদ্ধি না। আমাদের টীম লীডার হল রানা। ও যা বলে তাই করা হবে। আপনি গাড়ি-টাড়ি নিয়ে চলে যান।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আর সুলেমানকে বলুন সে যেন আর আমার পেছনে পেছনে না আসে।'

'জ্বি আচ্ছা, বলে দিচ্ছি। আপনাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা শুধু করি — সারা দিন খাননি, আমারই খারাপ লাগছে।'

'কিছু করতে হবে না।'

'আমি ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।'

'না। প্লীজ না।'

'খাবারগুলি প্যাকেট করে পৌঁছে দিই?'

'আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না।'

'আমি কি তা হলে চলে যাব?'

'হ্যাঁ, চলে যাবেন। দলবল নিয়ে যাবেন। **Leave us alone.**'

'জ্বি আচ্ছা। আপনার খুব কষ্ট হল।'

'কষ্ট কিছু হয়নি। আমি অনেক কিছু শিখেছি। রফিক সাহেব, আপনার সঙ্গে কি সিগারেট আছে? একটা সিগারেট দিন তো।'

রফিক বিস্মিত হয়ে তাকালেন। তাঁর কাছে সিগারেট ছিল না। তিনি সিগারেট আনতে নিজেই চলে গেলেন। শুভ্র দাঁড়িয়ে আছে।

হাজতের দরজা খোলা হয়েছে। ওসি সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আনুশকার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা বের হয়ে আসুন।

'আমাদের কি ছেড়ে দিচ্ছেন?'

'জ্বি।'

'জরীর কী হবে? ও কি ঐ বদমাশটার সঙ্গে যাবে, না আমাদের সঙ্গে যাবে?'

'সেটা উনি ঠিক করবেন। উনি যদি আপনাদের সঙ্গে যেতে চান, তা হলে যাবেন। আবার যদি মনিরুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে যেতে চান, তাও যেতে পারেন।'

'থ্যাংক য়্যু ওসি সাহেব। আপনি কি আরেকটা ছোট্ট কাজ করবেন?'

'কাজটা কী বলুন, দেখি পারি কি না।'

'আমি এই পাগলীটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।'

'ওকে নিয়ে কী করবেন?'

'আমি ওর চিকিৎসা করাব। সুস্থ করে তুলব।'

'মিস আনুশকা, এইসব শখ ক্ষণস্থায়ী হয়। কিছুদিন পর দেখবেন অসহ্য বোধ হচ্ছে। না পারছেন গিলতে, না পারছেন উগরে ফেলে দিতে। বরং সে এখানে থাকুক। আমি কোনো-একটা মহিলা সংগঠনে পাঠিয়ে দেব। যোগাযোগও করছি।'

'আমার সঙ্গে দিয়ে দিতে আইনগত কোনো বাধা আছে?'

'না, আইনগত কোনো বাধা নেই।'

'তা হলে ও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।'

ওসি সাহেব হেসে ফেললেন। আনুশকা বলল, মেয়েটার নাম কী?

'ওর নাম-টাম নেই — বা থাকলেও এখন কেউ জানে না।'

'না থাকলেই ভাল। আমি ওর নতুন একটা নাম দেব।'

নইমা ঘুমুচ্ছে। মুনা অনেক চেষ্টা করেও তার ঘুম ভাঙাতে পারছে না। আনুশকা বলল, মুনা, ভাল করে দেখ, মরে-টরে যায়নি তো?

মুনা হেসে উঠল খিলখিল করে। মুনার সঙ্গে পাগলীটাও হাসতে শুরু করল। তার হাসি আর থামে না। হাসির শব্দে ঘুম ভাঙল নইমার। সে হতচকিত গলায় বলল, কী হয়েছে? কী হয়েছে? মুনা হাসতে হাসতে বলল, আপা, আমাদের ছুটি হয়ে গেছে। আমরা এখন যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছি?'

'দারুচিনি দ্বীপ।'

'আমি কোথাও যাব না। আমি ঢাকা চলে যাব। আনুশকা, আমাকে ঢাকা পাঠাবার ব্যবস্থা কর। অসম্ভব, আমি তোদের সঙ্গে যাব না। মরে গেলেও না। মরে গেলেও না। মরো গেলেও না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তোকে ঢাকা পাঠাব। এরকম করিস না তো! গায়ে কি এখনো জ্বর আছে?'

মুনা বললো, হ্যাঁ আপা, জ্বর আছে। বেশ জ্বর।



জরী বলল, আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আমরা রেল-স্টেশনে বসে আছি কেন?

রানা রাগী গলায় বলল, রেল-স্টেশনে বসে আছি, কারণ এক জায়গায় বসে আলাপ-আলোচনা করে ডিসিশান নিতে হবে।

'কী ডিসিশান?'

'ডিসিশান হচ্ছে — আমরা কি আজ রাতেই কক্সবাজার রওনা হব, না আজ রাতটা চিটাগাং-এ থেকে পরদিন ভোরে রওনা হব।'

'ডিসিশান নিচ্ছ না কেন?'

'হুট করে তো আর ডিসিশান নেয়া যায় না। চিন্তা-ভাবনার ব্যাপার আছে। আনুশকা, তোমার কী মত?'

আনুশকা হাই তুলতে তুলতে বলল, তুমি হচ্ছ দলপতি। তুমি ডিসিশান নেবে। তুমি যা বলবে তাই হবে। তুমি যদি বল, রাত তিনটায় রওনা হবে — ফাইন উইথ মি।

বল্টু বলল, আমাদের খাওয়াদাওয়ার কী হবে রে রানা? খিদেয় মরে যাচ্ছি।

'খিদেয় মরে যাবি কী জন্যে? একটু আগে সবাইকে দেড় ফুট সাইজের একটা কলা খাওয়ালাম না?'

'এই কলাই কি আমাদের ডিনার?'

'আচ্ছা একটা কথা, আমরা কি খাওয়া দাওয়া করার জন্যে বের হয়েছি, না আমাদের অন্য উদ্দেশ্যও আছে?'

নীরা বলল, ক্ষুধার্ত অবস্থায় কিছুই ভাল লাগে না রানা। সুকান্তের মতো কবির কাছেও ক্ষুধার্ত অবস্থায় পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটির মতো মনে হয়েছে।

'হবে, খাবার ব্যবস্থাও হবে। আগে বাসার খোঁখবর করে দেখি। মোতালেব, তুই আয় আমার সঙ্গে।'

'আমি যাব কী জন্যে? আমি তো আর দলপতি না, কিংবা দলপতির অ্যাসিসটেন্টও না।'

রানা রাগ করেও বের হয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন কক্সবাজারে রওনা হওয়া ঠিক হবে না। পথে কোনো বিপদ-আপদ হয় কি না কে বলবে? জঙ্গলের ভেতর গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গেলো। চাকা ঠিক করা হচ্ছে, এর মধ্যে বেরিয়ে এল একদল ডাকাত। সঙ্গে এতগুলি মেয়ে . . . রিস্ক নেয়া যাবে না। রাতটা এখানেই থাকতে হবে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটাতে হবে। হোটেল নেয়ার প্রশ্নই আসে না। এত টাকা হোটেলওয়ালাকে সে কেন খামাখা দেবে? তা ছাড়া অনেক টাকা বাজেটের অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। আগে যে বাসা ঠিক করা হয়েছিল তাকে টাকা দিতে হয়েছে। আর একটা রাত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটানো এমন কিছু না।

রানা ভোরে রওনা হবার জন্যে বারো সীটারের একটা লক্কর মুড়ির টিন মার্কা মাইক্রোবাস ঠিক করল। সে-ই সবচে' কম ভাড়ায় যেতে রাজি হয়েছে।

রাতের খাবার কিনে ফিরল। পরোটা-গোশত।

আনুশকা পরোটা হাতে নিয়ে বলল, গোল গোল এই জিনিসগুলি কি?

রানা থমথমে গলায় বলল, কেন, পরোটা কখনো খাওনি?

'খেয়েছি। লোহার তৈরি পরোটা খাইনি। এইগুলি কীভাবে খায়?'

'খেতে না চাইলে খাবে না। আমাকে বাজেটের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। পোলাও-কোর্মা খাওয়ানো সম্ভব না। খিদে লাগলে খাবে, না লাগলে নাই।'

'গোশতগুলিও তো মনে হচ্ছে প্লাস্টিকের।'

রানা বলল, সবাই হাতে হাতে নিয়ে নাও — পারহেড দু'টা করে পরোটা।

নইমা কিছুই খেল না। সে ঢাকা চলে যাবে। কিছুতেই থাকবে না। তাকে টিকেট কেটে রাতের ট্রেনে তুলে দিলেই হবে। তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, সে বুঝ মানছে না।

নীরা বলল, এত কাছে এসে ফিরে যাবি?

'হ্যাঁ, ফিরে যাব।'

'এখন তো আর কোনো সমস্যা নেই।'

'সমস্যা নেই, সমস্যা হবে। আমার শিক্ষা হয়ে গেছে।'

নীরা বলল, দেখ নইমা, দারুচিনি দ্বীপ হচ্ছে আমাদের জন্যে একধরনের তীর্থ। তীর্থে যাবার জন্যে সবাই মন ঠিক করে অনেকে রওনাও হয়, কিন্তু তার পরেও সবার তীর্থ-দর্শন হয় না। তুই এত বড় সুযোগ হেলায় হারাবি?

'হ্যাঁ, হারাব। আমি এত পুণ্যবান নই যে তীর্থ-দর্শন করব। তোরা যা।'

'তুই সত্যি যাবি না?'

'না।'

ঠিক হল, নইমা ঢাকায় ফিরে যাবে। তার গায়ে জ্বর এবং বেশ ভাল জ্বর। তাকে একা একা ছেড়ে দেয়া যায় না। ছেলেদের একজন-কাউকে সঙ্গে যেতে হবে। কে যাবে সঙ্গে? রানা বলল, লটারি হবে। লটারিতে যার নাম উঠবে, সে যাবে। এটা ফাইন্যাল ডিসিশান। এ ছাড়া উপায় নেই। কাগজের টুকরায় সব ছেলেদের নাম লেখা থাকবে। নইমা চোখ বন্ধ করে একটা নাম তুলবে। যার নাম উঠবে তাকে যেতেই হবে —।

লটারি হল। নাম উঠল রানার। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

সঞ্জু বলল, দলপতি চলে গেলে আমাদের হবে কী করে? দলপতিকে তো যেতেই হবে। রানা থাকুক, আমি যাব।

রানা ক্ষীণ গলায় বলল, তুই যাবি?

সঞ্জু বলল, যে সব ব্যবস্থা করল, তা ছাড়া আমার চাকরির একটা ইন্টারভ্যুও আছে। তার প্রিপারেশন দরকার।

রানা বলল, তোরা কি মিষ্টিপান খাবি? পান নিয়ে আসি। রানা পান আনার কথা বলে সরে পড়েছে — কারণ তার চোখে পানি এসে গেছে। সঞ্জুটা এত ভাল কেন?

মানুষকে এত ভাল হতে নেই। মানুষকে কিছুটা খারাপ হতে হয়। সঞ্জুর ইন্টারভ্যু — এইসব বাজে কথা। সে এই কাজটা করল তার দিকে তাকিয়ে।

ঢাকাগামী তূর্ণা নিশীথা ছেড়ে দিচ্ছে। দরজা ধরে সঞ্জু দাঁড়িয়ে আছে। সঞ্জুর মুখ হাসি হাসি। সে হাত নাড়ছে। রানার খুব ইচ্ছা করছে টেনে সঞ্জুকে নামিয়ে সে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। কিন্তু সে জানে এই কাজটা সে পারবে না। সবার লোভ হয়, করতে পারে না। এই পৃথিবীতে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই আছে যারা জীবনের মোহের কাছে পরাজিত হয় না। সে সেই অল্প ক'জনের একজন নয়। তার জন্ম হয়েছে — লোভের কাছে, মোহের কাছে বারবার পরাজিত হবার জন্যে।



ইঞ্জিন বসানো ছিপছিপে ধরনের নৌকা। মাথার উপর একচিলতে ছাদ। ছাদের নিচে ইঞ্জিন। দেখলে বিশ্বাস হয় না এরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। কিন্তু মাঝি যখন বলছে তখন বিশ্বাস করতে হবে।

নৌকায় বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ উড়ছে। সেন্ট মার্টিন যেতে হলে বার্মার আকিয়াব শহরের পাশ দিয়ে যেতে হয়। জলযানগুলিতে সে কারণেই পতাকা ওড়াতে হয়। যাতে দূর থেকে বোঝা যায় — কোন নৌকা বাংলাদেশের, কোন্‌গুলি বার্মার।

নৌকার মাঝি চিটাগাংয়ের প্রায় দুর্বোধ্য ভাষায় বোঝাল — ইয়ান নাফ নদী, ইয়ানর অর্ধেক আঁরার, অর্ধেক বার্মার।

মোতলেব বলল, অত্যন্ত আপত্তিজনক কথা — নদীর আবার অর্ধেক অর্ধেক ভাগাভাগি কী? নদী হচ্ছে প্রেমিকার মতো। প্রেমিকার আবার ভাগাভাগি! এটা কি মগের মুল্লুক?

মাঝি দাঁত বের করে বলল, ইয়ান মগের মুল্লুক। বার্মাইয়ারা বেগ্‌গুন মগ।

আনুশকা বলল, ঢেউ কেমন?

'আছে, ছোড ছোড গইর।'

'কী বলছেন, বাংলা ভাষায় বলুন — ছোড ছোড গইর মানে কী?'

মাঝি আনন্দিত গলায় বলল, অল্প বিস্তর ঢেউ।

ঢেউ যা উঠছে তাকে অল্প বিস্তর বলাটা ঠিক হচ্ছে না। নীরা মুখ কালো করে ঢেউ দেখছে।

মুনা বলল, কী নীল পানি দেখছেন আপা? নদীর পানি এত নীল হয়? আশ্চর্য!

নীরা জবাব দিল না। নাফ নদীর নীল পানি তাকে অভিভূত করতে পারছে না। হঠাৎ তার মনে পড়েছে, সে সাঁতার জানে না। সে রানার দিকে তাকাল।

রানা খুব ব্যস্ত হয়ে নৌকায় জিনিসপত্র তুলছে। মালামালের সঙ্গে প্রচুর ডাবও যাচ্ছে। রানা কোত্থেকে যেন সস্তা দরে আঠারোটা ডাব কিনেছে। সাগরে মিষ্টি পানির সাপ্লাই।

মোতালেব রানাকে সাহায্য করছে। বল্টু দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। বল্টুর মন খুব খারাপ। ট্রেনে ওঠার পর থেকে মুনা তার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। এর মানে সে বুঝতে পারছে না।

মুনার পুরো ব্যাপারটাই সবসময় তার কাছে এক ধরনের রহস্য। মেয়েটা তাকে পছন্দ করে, না করে না? তাকে সে একটা স্যুয়েটার কিনে দিয়েছে। ধরে নেয়া যেতে পারে, পছন্দ করে বলেই দিয়েছে। কিন্তু কথাবার্তায় কিংবা আচার-আচরণে তার কোনো প্রমাণ নেই।

বল্টুর একবার ধারণা হয়েছিল, তার বড় ভাই উপস্থিত বলেই মুনা তার সঙ্গে কথা বলছে না। মেয়েরা আড়াল পছন্দ করে। কিন্তু সঞ্জু তো কাল রাতেই চলে গেছে। এর পরেও মুনা কথা বলবে না কেন? বল্টু নিজ থেকে উদ্যোগ নিয়ে আজ ভোরবেলা কথা বলার চেষ্টা করেছে। মুনাকে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে বলেছে — মুনা, চা খেতে যাবি? একটা দোকানে দেখলাম গুড়ের চা বানাচ্ছে।

মুনা বলল, গুড়ের চা খাবার জন্যে আমি খুব ব্যস্ত হয়ে আছি আপনাকে কে বলল? চিনির চা-ই খাই না, তো গুড়ের চা।

'চা না খেলে না খাবি — চল, হেঁটে আসি।'

'আপনার সঙ্গে হাঁটতে যাব?'

'হ্যাঁ। অসুবিধা আছে?'

'অবশ্যই অসুবিধা আছে। বাঁটকু লোকের সঙ্গে আমি হাঁটি না। লোকজন দেখে ফিক ফিক করে হাসে। তারা মনে মনে বলে — লম্বা মেয়েটা এই বাঁটকুটার সঙ্গে হাঁটছে কেন?'

বল্টুর মন এই কথায় অত্যন্ত খারাপ হল। এই-জাতীয় কথা কি কেউ বলতে পারে? বলতে পারা কি উচিত? মুনার দেয়া স্যুয়েটার সে এখন পরে আছে। ইচ্ছা করছে স্যুয়েটারটা খুলে টেকনাফের নদীতে ফেলে দিতে। দরকার নেই শালার স্যুয়েটারের!

রানা বিরক্ত গলায় বলল, তোরা সব হাবার মতো তীরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমাদের কি রওনা দেয়া লাগবে না? জোয়ার-ভাটার ব্যাপার আছে। যাকে বলে সমুদ্রযাত্রা। এক্ষুনি রওনা দিতে হবে। নো ডিলে।

নীরা নিচু গলায় বলল, আমি যাচ্ছি না।

রানা হতভম্ব হয়ে বলল, আমি যাচ্ছি না মানে?

'আমি সাঁতার জানি না।'

'আমরা তো সাঁতরে যাচ্ছি না। নৌকায় করে যাচ্ছি।'

'আমার ভয় লাগছে। আমি যাব না।'

রানা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বলার চেষ্টা করল — ঢেউ যা একটু নদীতেই দেখা যাচ্ছে — নৌকা সমুদ্রে পড়লেই সব শান্ত। তাই না মাঝি?

মাঝি হাসিমুখে বলল, উল্টা কথা ন-কইও। সাগরে ডাঙ্গর ডাঙ্গর গইর ঢেউ। তুই ন-জান?

নীরা বলল, অসম্ভব, আমি যাব না। আমাকে বটি দিয়ে কুচিকুচি করে কেটে ফেললেও যাব না।

আনুশকা বলল, শোন নীরা, তীর্থস্থানে সবার যাবার সৌভাগ্য হয় না। অনেকেই খুব কাছ থেকে ফিরে যায় . . .

নীরা আনুশকাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, স্যরি, এক সময় আমি এরকম কথা বলেছিলাম। আমি সবার কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি যাব না। প্লীজ, না।

নীরার গলায় এমন কিছু ছিল যে সবাই বুঝল, নীরা যাবে না। কেউ কিছু বলল না। দীর্ঘ সময় সবাই চুপচাপ। রানার চোখে পলক পর্যন্ত পড়ছে না।

জরী বলল, নীরা, সত্যি যাবে না?

'না জরী। আমি যাব না। নৌকায় উঠলেই আমি ভয়ে মরে যাব। আমি পানি অসম্ভব ভয় পাই। তোদের সঙ্গে ঠিক করেছি কিন্তু আসল কথটাই কখনো মনে আসেনি।'

মুনা বলল, তাহলে কী হবে?

'আমাকে নিয়ে কাউকে চিন্তা করতে হবে না। আমি একটা বাস ধরে কক্সবাজার চলে যাব। সেখান থেকে ঢাকা।'

আনুশকা বলল, এটা একটা কথা হল?

'আমি যা করছি খুব অন্যায় করছি। আমি সেটা জানি।'

'ভয়কে জয় করতে হয় নীরা।'

'সব ভয় জয় করা যায় না।'

রানা বলল, এখন তা হলে কী করা? নীরাকে একা একা যেতে দেয়া যায় না। একজন-কাউকে নীরার সঙ্গে যেতে হবে। কে যাবে?

বল্টু বলল, আমি। আমি নিয়ে যাব।

মুনা অবাক হয়ে বল্টুর দিকে তাকিয়ে আছে। কী বলছে এই মানুষটা? সে কি মুনার উপর রাগ করে বলছে? এত রাগ কেন? মুনার সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল। তার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করল — অয়ন ভাই, আপনি যাবেন না। প্লীজ, প্লীজ। আমি নিতান্তই দরিদ্র পরিবারের একটা মেয়ে। আপনিও হত-দরিদ্র একজন মানুষ। কোনোদিন যে আবার আমরা সমুদ্রের কাছে আসতে পারব — আমার মনে হয় না।

কী সুন্দর একটা সুযোগ! আমার উপর রাগ করে আপনি এই সুযোগটা নষ্ট করবেন না। আমি জানি, আমি নানানভাবে আপনাকে কষ্ট দিই। আপনাকে আহত করি। কেন করি আমি নিজেও জানি না। প্রতিবার কষ্ট পেয়ে আপনি যখন মুখ কালো করেন তখন আমার ইচ্ছা করে খুব উঁচু একটা বিল্ডিং-এ উঠে সেখান থেকে লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে যেতে। অয়ন ভাই, বলুন তো আমার স্বভাবটা উল্টো হল কেন? কেন আমি আর দশটা মেয়ের মতো স্বাভাবিক হলাম না? আপনার ধারণা, আমি খুব বাজে ধরনের একটা মেয়ে। আপনার এই ধারণা সত্যি নয়। খুব ভুল ধারণা। আমি যে কত ভাল একটা মেয়ে সে জানে শুধু আমার মা। একদিন আপনিও জানবেন। সেই দিনটির জন্যে আমি কত যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি! অয়ন ভাই, আমাদের আর্থিক অবস্থাটা যে কত খারাপ সেটা তো আপনি জানেন — তার পরেও মা'র সংসার-খরচের টাকা চুরি করে আপনার জন্যে একটা স্যুয়েটার কিনলাম। আপনার একটাই স্যুয়েটার। সেটাও অনেকখানি ছেঁড়া। ছেঁড়া ঢাকার জন্যে আপনি সবসময় স্যুয়েটারের উপর একটা শার্ট পরেন। একদিন আমাকে বললেন — মানুষ কেন যে শার্টের উপর স্যুয়েটার পরে আমি জানি না। কী বিশ্রী লাগে দেখতে! মনে হয় শার্টের উপর একটা ভারী গেঞ্জি পরে আছে।

আপনার কথা শুনে আমি সেদিন কী কষ্ট যে পেয়েছিলাম! সারা রাত কেঁদেছি আর বলেছি, কেন একজন মানুষ আপনার মত দরিদ্র হয় — আর কেন আরেকজন হয় শুভ্র ভাইয়ার মতো ধনী?

নানা ধরনের কষ্টের মধ্যে আমি বড় হচ্ছি। একধরনের আশা নিয়ে বড় হচ্ছি — গভীর রাতে ঘুম ভেঙে হঠাৎ মনে হয় — হয়তো সামনের দিনগুলি অন্যরকম হবে।

অয়ন ভাই, আমি একটা ঘোরের মধ্যে আপনার সঙ্গে দৌড়াতে দৌড়াতে ট্রেনে উঠে পড়লাম। সবাই আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছিল। আমি কিন্তু একটুও লজ্জা পেলাম না। মনে মনে বললাম — এই ব্যাপারটা নিয়তি সাজিয়ে রেখেছে। নিয়তি চাচ্ছে আমি যাই আপনার সঙ্গে।

রাতে একসময় আপনারা সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি কিন্তু জেগে রইলাম। জেগে জেগে ঠিক করলাম দারুচিনি দ্বীপে নেমে আমি কী করব। কী করব জানেন? আমি আপনার কাছে গিয়ে বলব, — অয়ন ভাই, আসুন তো আমার সঙ্গে — সমুদ্রে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়াই। আপনি অবাক হয়ে আসবেন আমার সঙ্গে। আমি এক সময় বলব, আমার কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে। আপনি আমার হাতটা একটু ধরুন তো! আপনি হাত ধরবেন আর সঙ্গে সঙ্গে আমি বলব — অয়ন ভাই, আমি আপনাকে নিয়ে এত ঠাট্টা-তামাশা করি। আমি জানি আপনি খুব রাগ করেন। কিন্তু আমি যে আপনাকে কতটা ভালবাসি তা কি আপনি জানেন? এই সমুদ্রে যতটা

পানি আছে, বিশ্বাস করুন অয়ন ভাই, আপনার প্রতি আমার ভালবাসা তারচে' অনেক অনেক গুণ বেশি। অয়ন ভাই, এখন যদি আপনি চলে যান তা হলে আমি কথাগুলি কীভাবে বলব?

মুনা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রানা নীরার স্যুটকেস নামিয়ে দিচ্ছে। রানা বলল, মুনা, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন? উঠে আয়। মুনা উঠে এল।

নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। ইঞ্জিনের ভট্ ভট্ শব্দ হচ্ছে। ভাল দুলুনি হচ্ছে। নীরা হাত নাড়ছে। বল্টু হাত নাড়ছে না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

আনুশকা বলল, যেভাবে মানুষজন কমছে শেষ পর্যন্ত ক'জন গিয়ে দারুচিনি দ্বীপে পৌঁছব কে জানে?

নদীর মোহনা ছেড়ে নৌকা সাগরে পড়ল। গাঢ় নীল সমুদ্র।

যেন এক জীবন্ত নীলকান্ত মণি। শুভ্র মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, এত সুন্দর! এত সুন্দর!

বড় বড় ঢেউ উঠতে শুরু করেছে। নৌকা খুবই দুলছে। রানা ভীত গলায় বলল, আমরা সবাই কি মারা পড়ব নাকি? ভয়াবহ অবস্থা দেখি! জরী, তোমার ভয় লাগছে?

জরী বলল, না।

এক-একটা বড় ঢেউ আসছে। পাগলী মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠছে।

আনুশকা বলল, এই মেয়েটার একটা নাম দেয়া দরকার। কী নাম দেয়া যায়? মোতালেব, একটা নাম বল তো!

মোতালেব বলল, নিজে বেঁচে থাকলে তারপর অন্যের নাম। অবস্থা যা দেখেছি বাঁচব বলে তো মনে হয় না। মাঝি ভাই, বলেন তো নৌকা ডোবে কখনও?

মাঝি সহজ গলায় বলল, ডুবে। আকছার ডুবে।

'নিশ্চয় ঝড়-তুফানের সময় ডোবে। আজ তো ঝড়-তুফান নেই। তাই না মাঝি?'

'আশ্বিন মাসে সাগর মাঝেমইধ্যে বিনা কারণে পাগলা অয়। তখন বড়ই সমস্যা।'

'আজ কি সাগার পাগলা হয়েছে?'

'হেই রকমই মনে লয়।'

রানা বলল, ফিরে যাবার আইডিয়াটা তোমাদের কাছে কেমন মনে হচ্ছে আনুশকা?

'খুব খারাপ মনে হচ্ছে। যে ফিরে যেতে চায় তাকে ফিরতে হবে সাঁতার দিয়ে।'

মোতালেব বলল, ভয় যে পরিমাণ লাগছে — ভয়ের চোটে একটা কেলেঙ্কারি না করে ফেলি — কিংবা কে জানে হয়তো ইতিমধ্যেই কেলেঙ্কারি করে ফেলেছি। শরীরটা হালকা হালকা লাগছে।

জরী হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, ভয়ের মধ্যেও তোমার সেন্স অব হিউমার যে নষ্ট হয়নি সেটা খুব ভাল লক্ষণ না।

আনুশকা বলল, আচ্ছা, আমরা এই মেয়েটার কেউ কোনো নাম দিচ্ছি না কেন? শুভ্র, তুমি এর একটা নাম দাও —

'আমি ওর নাম দিলাম — ঊর্মি। ঢেউ।'

'জরী, তোর মাথায় কি কোনো নাম আসছে?'

'না, আমার মাথায় কোনো নাম আসছে না। আমার এখন কেমন জানি ভয়-ভয় লাগছে। মাঝি, নৌকা উল্টাবে না তো?'

'সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা আম্মা।'

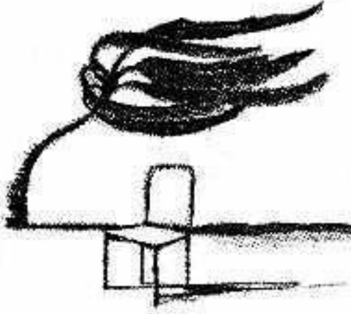
ঢেউয়ের পানি পাহাড়ের মতো সারি বেঁধে ছুটে আসছে। শুভ্র মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, কি সুন্দর, অথচ কী ভয়ংকর!

মাঝি চেঁচিয়ে বলল, নৌকা ধর, গরি ধরিঅরে বইয়। অবস্থা ভাল ন-দেকির।

শুভ্র নৌকা ধরল না। সে চেঁচিয়ে বলল, দেখো দেখো, সমুদ্র-সারস। সমুদ্র-সারস। তারা নৌকাকে ঘিরে ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। মনে হচ্ছে তারা যাচ্ছে কোনো-এক অজানা দারুচিনি দ্বীপে।

আনুশকা বলল, দ্বীপটা কি দেখা যায়?

মাঝি আঙুল তুলে দেখাল। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ঐ তো দেখা যায়। এত সুন্দর! আশ্চর্য, এত সুন্দর!



ইয়াজউদ্দিন সাহেব ঠিক করে রেখেছিলেন সারা দিন ঘরেই কাটাবেন। রাতে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন। বন্ধুবান্ধবের বাসায় নয়। তেমন কোনো বন্ধুবান্ধব তাঁর নেই। গাড়িতে উঠে বসবেন — ড্রাইভারকে বলবেন, ঢাকা-চিটাগাং হাইওয়ে ধরে খানিকক্ষণ যাও। অতি দ্রুত রাস্তায় খানিকক্ষণ ঘুরলে ভাল লাগে। মানুষের জন্মই হয়েছে দ্রুত চলার জন্যে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে না। গাছ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। মানুষ গাছ নয়।

তিনি অপেক্ষা করছেন টেলিফোন কলের জন্যে। রফিকের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তিনি খবর পেয়েছেন, তারা হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছে। তিনি কথা বলতে চান মনিরুজ্জামানের সঙ্গে। ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টেলিফোন বাজছে।

তিনি রিসিভার কানে ধরলেন। মৃদু গলায় বললেন, কে কথা বলছেন?

'স্যার আমি — আমি মনিরুজ্জামান।'

'কী ব্যাপার?'

'স্যার, আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থি। আমি, আমি . . .'

'ঠিক আছে, আপনাকে ক্ষমা করা হল — ঐ মেয়েটির যদি কোনোরকম সমস্যা হয় . . .'

'স্যার, কোনো সমস্যা হবে না।'

'গুড।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। "মুন ইজ ডাউন" বইটির শেষ পাতাটা পড়া বাকি ছিল। শেষ পাতা পড়লেন। বইটা তাঁর ভাল লাগেনি। তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো শেষ পাতায় নতুন কিছু বলা হবে। তাও না। বইটিতে এমন এক জগতের কথা বলা হয়েছে, যে জগতের অস্তিত্ব আছে শুধুই কল্পনায়। বাস্তব পৃথিবী এমন নয়। বাস্তব পৃথিবীতে মনিরুজ্জামানরা বাস করে। শুভ্র এই সত্যটা কখন বুঝবে? যদি বুঝতে পারত তা হলে এই বইটি ডাস্টবিনে ফেলে দিত। তাঁর নিজের সেরকমই ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু শুভ্র এই বই তাঁকে দিয়েছে জন্মদিনের উপহার হিসেবে। অসম্ভব সুন্দর একটি বাক্য লিখে দিয়েছে। এত সুন্দর কথা লেখা একটা বই তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে শুভ্রর প্রসেসমেন্ট ঠিক

নয়। তিনি আদর্শ মানুষ নন। একজন আদর্শ মানুষ কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে পারে না। আমাদের প্রফেট আদর্শ মানুষ ছিলেন। তাঁর ছিল দিনে আনি, দিনে খাই অবস্থা।

আচ্ছা, শুভ্র কি আদর্শ মানুষ হবে? যদি হয় একদিন তারও তো তা হলে দিনে আনি দিনে খাই অবস্থা হবে! তিনি কি তা সহ্য করতে পারবেন? কিন্তু তিনি চান শুভ্র আদর্শ মানুষ হোক। শুভ্রর যে রাতে জন্ম হল সে রাতে তিনি বড় ধরনের একটা অন্যায় করে বিশাল অঙ্কের টাকা পেয়ে গেলেন। ব্রীফকেস ভর্তি টাকা নিয়ে হাসপাতালে গেলেন ছেলেকে দেখতে — আহা, কী সুন্দর, কী ফুটফুটে ছেলে! নবজাতক শিশু হাসতে পারে না — কিন্তু তিনি পরিষ্কার দেখলেন যে, ফুলের মতো শিশু তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল। হয়তো তাঁর চোখের ভুল। হয়তো তাঁর কল্পনা। কিন্তু তিনি দেখলেন। নার্স বলল, বাচ্চা কোলে নেবেন?

তাঁর হাত অশুচি হয়ে আছে। এই অশুচি হাতে বেহেশতের ফুল স্পর্শ করা যায় না। তবু তিনি দু'হাত বাড়িয়ে বললেন — দিন। আমার কোলে দিন।

বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে তিনি তার নাম রাখলেন — শুভ্র। তিনি মনে মনে বললেন — আমার এই ছেলেকে যেন পৃথিবীর কোনো মালিন্য, কোন নোংরামি কখনো স্পর্শ না করে — সে যেন তার নামের মতোই হয়।

আচ্ছা, শুভ্র কি পারবে? নিশ্চয়ই পারবে। কেন পারবে না? সৎ প্রবৃত্তি নিয়েই মানুষ জন্মায়। চারপাশের মানুষ তাকে অসৎ করে। তিনি শুভ্রকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছেন। পৃথিবীর কোনো মালিন্য শুভ্রের কাছে ভিড়তে দেননি।

তিনি কোটি কোটি টাকা শুভ্রের জন্যে রেখে যাচ্ছেন। টাকার পরিমাণ কল্পনার উপরে। এই অর্থ সৎ অর্থ নয়। শুভ্র এই অর্থ দিয়ে কী করে তা তাঁর দেখার ইচ্ছা। মৃত্যুর পর কোনো-একটা জগৎ যদি সত্যি থাকে তা হলে সেখান থেকে তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখবেন।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব গাড়ি বের করতে বলে স্ত্রীর খোঁজে গেলেন। নিশিরাতে হাইওয়েতে ছুটে বেড়ানো রাহেলার পছন্দের কর্মকাণ্ডের একটি নয়। তিনি হয়তো যেতে চাইবেন না।

রাহেলার ঘর অন্ধকার। তিনি বাতি জ্বালালেন। অন্ধকার ঘরে খাটের ঠিক মাঝখানে জবুথবু হয়ে রাহেলা বসে আছেন।

'কী হয়েছে?'

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, কিছু না।

'ঘর অন্ধকার করে এভাবে বসে আছ কেন?'

'আমার শুভ্রের জন্যে খুব খারাপ লাগছে।'

'আবার দুশ্চিন্তা করছ?'

রাহেলা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, একদিন তুমি আমি — আমরা কেউ থাকব না। আমার এই ছেলের চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। কে তখন দেখবে আমাদের শুভ্রকে?

ইয়াউদ্দিন সাহেব স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, চলো, ঘুরে আসি। ১০০ কিমি স্পীডে হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালাব। আমি চালাব, তুমি বসে থাকবে পাশে। আর শোনো রাহেলা — যা হবার তাই হবে — "কে সারা সারা"।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'এখনো জানি না কোথায় যাচ্ছি। আগে চলো গাড়িতে উঠি।'

'আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।'

'তোমার শরীর ঠিকই আছে। আসলে তোমার মন ভাল নেই। গাড়িতে উঠলেই তোমার মন ভাল হতে শুরু করবে। মন ভাল হয়ে গেলেই শরীর ভাল লাগতে শুরু হবে।

ঢাকা-চিটাগাং হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব এক্সিলেটারের চাপ ক্রমেই বাড়াচ্ছেন। রাহেলা বসে আছেন মূর্তির মতো। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, তোমার কি ভয় লাগছে রাহেলা?

রাহেলা যন্ত্রের মতো বললেন, না।

'গুড। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখো কত সুন্দর চাঁদ উঠেছে। চাঁদটাও ছুটছে আমাদের সঙ্গে। দেখছ?'

'হুঁ।'

'তোমার কি মনে হয় হাত বাড়ালেই চাঁদটাকে ছোঁয়া যায়?'

রাহেলা এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, তুমি আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে?

ইয়াজউদ্দিন সাহেব গাড়ির স্পীড আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমি কখনো তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলিনি।

'তাহলে বলো, শুভ্র আর কতদিন পরে চোখে দেখতে পাবে? ডাক্তারের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে। তুমি এটা জান। আমাকে বলো।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব গাড়ির গতি কমিয়ে একসময় গাড়ি থামিয়ে ফেললেন। যতদূর দৃষ্টি যায় — ধানক্ষেত। ধানক্ষেতের মাথার উপর বিশাল চাঁদ। ইয়াজউদ্দিন সাহেব গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, রাহেলা, তুমিও নামো —।

'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। জবাব দাও।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে প্রশ্নটা শুনতে পাননি। রাহেলা গাড়ির ড্যাসবোর্ডে মাথা রেখে কাঁদছেন।



দারুচিনি দ্বীপে জোছনার ফিনিক ফুটেছে। দ্বীপের চারপাশের জলরাশিতে প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদের আলো। এই আলো স্থলভূমির আলোর চেয়েও অনেক রহস্যময়। তীব্র অথচ শান্ত। এই আলো কোনো-এক অদ্ভুত উপায়ে সরাসরি হৃদয়ের অন্ধকার কুঠুরিতে চলে যায়। মানুষের মনে তীব্র এক হাহাকার জেগে ওঠে। সেই হাহাকারের কারণ মানুষ জানে না। প্রকৃতি তার সব রহস্য মানুষের কাছে প্রকাশ করে না।

শুভ্র বসেছে একেবারে জরীর গা ঘেসে। জরীর অন্য পাশে আনুশকা। তাদের কাছ থেকে অনেকটা দূরে সমুদ্রের কাছাকাছি মুনা আছে। মোতালেব এবং রানা অস্তির ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছে। তাদের দৃষ্টি বড় একটা প্রবাল খণ্ডের উপর বসে থাকা পাগলী মেয়েটির দিকে। মেয়ের ভাব ভঙ্গি ভাল লাগছে না। মাথা ঠিক নেই কখন কি করে বসে। হয়ত ঝাপ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল।

আনুশকা শুভ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন লাগছে শুভ্র?

'খুব খারাপ লাগছে?'

আনুশকা বিস্মিত হয়ে বলল, খারাপ লাগছে কেন?

শুভ্র সহজ গলায় বলল, এত সুন্দর পৃথিবী কিন্তু আমি এই সুন্দর বেশিদিন দেখব না। আমার চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর অল্প কিছুদিন তারপর আমি সত্যি সত্যি কানাবাবা হয়ে যাব।

জরী বলল, কি বলছ তুমি?

'সত্যি কথা বলছি। আমিতো কখনো মিথ্যা বলি না। যার নাম শুভ্র সে মিথ্যা বলবে কি করে? আমার চোখের নার্ভ শুকিয়ে যাচ্ছে।'

অনুশকা বলল, এই প্রসঙ্গটা থাক। অন্য কিছু নিয়ে কথা বলা যাক। এসো আমরা সবাই আমাদের জীবনের একটা সুন্দর অভিজ্ঞতার গল্পবলি। ডাক ডাক সবাইকে ডাক। এই তোমরা আস।

সবাই এল। শুধু পাগলি বসে রইল। পাথরের উপর। আমি আমার জীবনের একটা সুন্দর অভিজ্ঞতার গল্প বলব — তারপর তোমরা বলবে। তারপর সবাই মিলে হাত ধরাধরি করে সমুদ্রে নমব। গল্পটা হচ্ছে — ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর আমার মা মারা যান। আমি খুব একলা হয়ে পড়ি। তখন আমার বাবা প্রায়ই

আমাকে নিয়ে গ্রামে ঘুরতে যেতেন। একবার নেত্রকোনার এক গ্রামে গিয়েছি। সন্ধ্যাবেলা এক বাউলের ঘরে বাবা আমাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। কি যে সুন্দর সেই বাউলের চেহারা — অবিকল শুভ্রের মত। বড় বড় চোখ কি অদ্ভুত দৃষ্টি। বাবা বললেন — আমার এই মেয়ের মনটা খুব খারাপ। আপনি গান গেয়ে আমার মেয়েটার মন ভাল করে দিন। বাউল এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গান ধরল —

"তুই যদি আমার হইতি
আমি হইতাম তোর।
কোলেতে বসাইয়া তোরে করিতাম আদর
বন্ধুরে . . ."

কি যে অদ্ভুত গান — আমার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। ইচ্ছে করল কাঁদতে কাঁদতে বাউলকে বলি — আমি আপনার কোলে বসছি — নিন আমাকে আদর করুন।

বলতে বলতে আনুশকার চোখে পানি এসে গেলো। সে চোখ মুছল না। জলভরা চোখে জরীরর দিকে তাকিয়ে হাসলো।

জরী ছটফটে গলায় বলল, আমার কেমন জানি লাগছে। শুভ্র, আমার কেমন জানি লাগছে।

আনুশকা জরীর হাত ধরে ফেলল। ভীত গলায় বলল, তুই এমন করছিস কেন? তোর হাত-পা কাঁপছে!

জরী বলল, তুই আমার হাত ছাড়, আমি সমুদ্রে নামব।

'অসম্ভব! আমি তোকে ছাড়ব না।'

রানা বলল, পাগলী মেয়েটাকে তো দেখছি না। ও কোথায়?

মোতালেব আঙুলের ইশারা করে দেখাল — ঐ তো, মেয়েটা সমুদ্রের ধার ঘেঁসে ছুটে যাচ্ছে।

আনুশকা বলল, ওকে তোমরা আটকাও। কী করছে এই মেয়ে?

মোতালেব অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আনুশকা, ঐ মেয়েটার কাছে তুমি একা যাও। বুঝতে পারছ না ও সব কাপড় খুলে ফেলেছে? ও নগ্ন হয়ে দৌড়াচ্ছে।

আনুশকা বলল, তোমরা আমার সঙ্গে আসো। আমার একা যেতে ভয় লাগছে। কী হচ্ছে এসব?

আনুশকা ছুটে যাচ্ছে। পাগলী মেয়েটার খিলখিল হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আনুশকার পেছনে পেছনে যাচ্ছে মোতালেব এবং রানা।

জরী বলল, শুভ্র, সমুদ্রে নামবে? এসো।

শুভ্র বলল, এখন সমুদ্রে নেমো না জরী। আমার কেন জানি ভাল লাগছে না। যদি নামতে হয় আমরা সবাই হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে নামব।

'না, আমি এখন নামব।'

'প্লীজ জরী, প্লীজ!'

মধ্যরাতে তারা সবাই হাত ধরে একসঙ্গে সমুদ্রে নামল। আনুশকা বলল, তোমরা সবাই তোমাদের জীবনের সবচে' কষ্টের কথাটা সমুদ্রকে বলো। আমরা আমাদের সব কষ্ট সমুদ্রের কাছে জমা রেখে ডাঙায় উঠে আসব। বলো মুনা, তুমি প্রথম বলো —

মুনা শান্ত গলায় বলল, আমার কোনো দুঃখ নেই।

মুনার কথা শেষ হবার আগেই সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ এসে সবাইকে ভিজিয়ে দিল। সমুদ্র মনে হয় মিথ্যা কথা বুঝতে পারে। পাগলী মেয়েটি হেসে উঠল খিলখিল করে।

শুভ্র হঠাৎ আতঙ্কিত গলায় বলল, আচ্ছা, জোছনা হঠাৎ কমে গেল কেন?

জোছনা কমেনি, জোছনা আরো তীব্র হয়েছে। মনে হচ্ছে সারা দ্বীপে হঠাৎ করে সাদা রঙের আগুন লেগে গেছে। কিন্তু শুভ্র কিছু দেখতে পাচ্ছে না কেন? শুভ্রের হাত ধরে জরী দাঁড়িয়ে — এত কাছে, কিন্তু কই — জরীকে সে তো দেখতে পাচ্ছে না?

— × —